আল্লামা জিল্লুর রাহমান

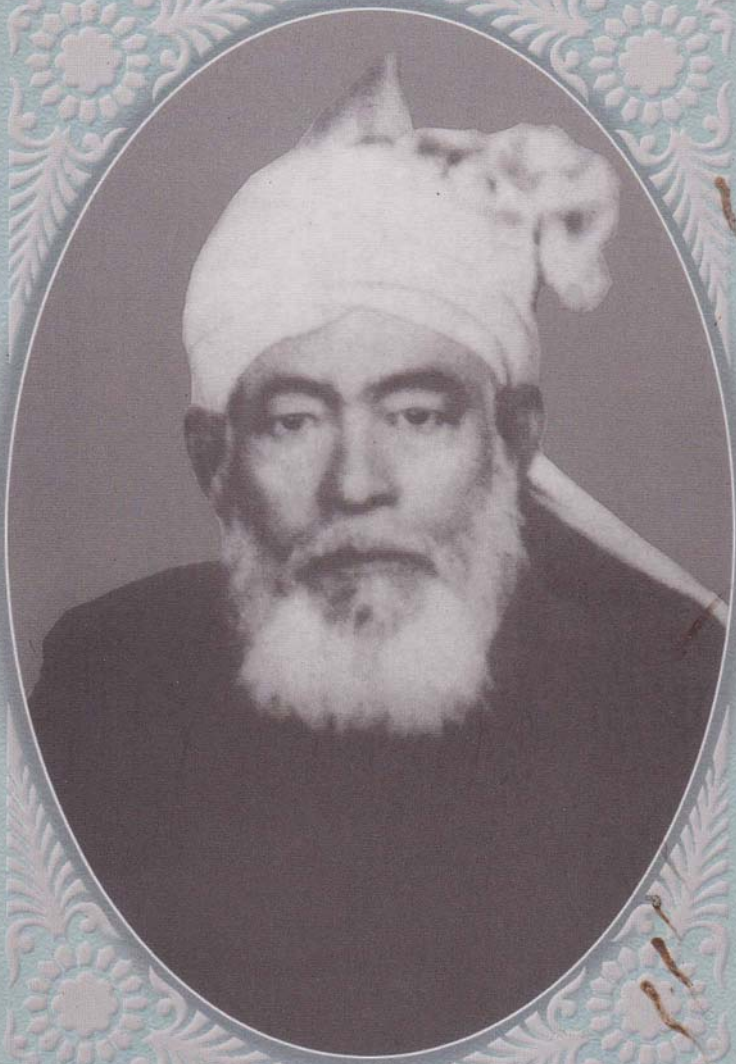

মুজীব-উর-রহমান

আল্লামা জিল্লুর রাহমান

(জীবন-স্মৃতি)

মুজীব-উর-রহমান

আল্লামা জিল্লুর রাহমান (জীবন-স্মৃতি)
মূল ঃ মুজীব-উর-রহমান
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ্ আহমদ
অনুলিখন ঃ হামিদুর রহমান

প্রকাশক ঃ
হামিদুর রহমান
৫৫/১ মধ্য বাসাবো
ঢাকা-১২১৪

প্রকাশকাল ঃ
ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ইং

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
আতাউর রহমান
ধ-ব্লক, বাড়ী নং- ৩৫৪
মিরপুর সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণ ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েট
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ
বাংলাদেশ ৫০.০০ টাকা
বিদেশ ৫.০০ মার্কিন ডলার

উৎসর্গ

আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেবের
আগামী প্রজন্ম এবং শুভানুধ্যায়ীগণের প্রতি

সূচী-পত্র

- মুখবন্ধ ৫
- বাংলাদেশে আহমদীয়তের উন্মেষ ১১
- কাসাইট গ্রামের দুই কৃতীসন্তান ১৫
- আল্লাহ্‌র পথে হিজরত ১৮
- বিগলিত চিত্তের দোয়া ২০
- ক্বারী নঈম উদ্দিন ২৪
- মহান শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরী ২৯
- কর্ম জীবন ৩৩
- ব্যাক্তিত্ব ও চরিত্র ৫০
- পরিবার-পরিজন ৬৩
- মহা প্রস্থান ৬৮
- সুফী মতিউর রহমান ৭২
- আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেবের রচিত ৩টি প্রবন্ধ
  - ১. ইসলামের কষ্টি ৭৯
  - ২. ধর্মের সাম্রাজ্যবাদ ও কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৫
  - ৩. জন্ম ও জন্মান্তরবাদ ৯০
- সঙ্কেত পঞ্জী ৯৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

মানব জীবনের জন্য যেমন স্মরণশক্তি অপরিহার্য। তেমনি মানব জীবনের ইতিহাসের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণশক্তি না থাকলে মানব জীবন হবে অসঙ্গত। মানুষ ঘুরে বেড়াবে পথহারা হয়ে। সে জানবে না কোথা থেকে সে এসেছে এবং কোথায় সে যাবে। তার উদ্দেশ্যই বা কী এবং কোথায় তার গন্তব্য? ঠিক এভাবেই দলগত ও জাতীয় জীবনে যদি ইতিহাসের জ্ঞান না থাকে তাহলে এ জ্ঞানশূন্যতা উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ইতিহাস আমাদেরকে অতীত সম্বন্ধে জ্ঞাত করে। আমাদিগকে সূত্র দেয় যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি। কোথায় আমাদের পৌঁছুতে হবে। ইতিহাস আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দিক-নির্দেশনা দেয়, আমাদের পূর্বসূরীদের জীবন সম্বন্ধে অবগত করে এবং আমাদের মন-মানসিকতায় এক কল্যাণময় উদ্যমের সৃষ্টি করে। ইতিহাস থেকে মানুষ যদি শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে জাতি এবং ব্যক্তি জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

জাতিগত ইতিহাস পাঠের চেয়ে ব্যক্তিগত ঘটনা বহুল জীবনতিহাস পাঠ করা সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কল্যাণকর। কারণ পাঠক এ সকল ঘটনা হতে অতি সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই বনী ঈসরাঈল-এর গোটা ইতিহাসের বিপরীতে হযরত ইব্রাহীম (আ:)-এর একটি ঘটনাই হৃদয়কে প্রভাবিত করে ফেলে।[১] হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:) বার বার এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, প্রাথমিক যুগের বুযূর্গগণের আহমদীয়ত গ্রহণ করার ঘটনাসমুহ পুন: পুন: আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের জীবন-স্মৃতি লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো তাঁর বংশধর যেন এর দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাঁর প্রত্যাশাগুলো যেন পূর্ণ করতে পারে যা তিনি তাঁর বংশধরদের কাছে চেয়েছিলেন। এ বইয়ের সর্বপ্রথম সম্বোধন লেখক নিজে এবং মরহুমের অন্যান্য সন্তান-সন্ততি। দ্বিতীয় সম্বোধন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের যুবকগণ এবং আগামী প্রজন্ম। বাংলার "আস্ সাবেকুনাল আওওয়ালুন"(প্রথম সারির) আহমদীদের স্মরণ, যা আমাদের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে তা থেকে আমাদের যুবকগণ কিছু হলেও উপকৃত হতে পারে।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ছিলেন খেলাফতে সানীয়ার প্রাথমিক যুগে বয়াত গ্রহণকারী যুবকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কয়েক দিক হতে প্রথম সারিতে ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) কর্তৃক ১৯১৭ সনে ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী তাহরীকে লাব্বায়েককারী প্রথম বাঙ্গালী মোবাল্লেগ হিসাবে বাংলাদেশে নিযুক্ত হন। তাঁর পরিবার অবিভক্ত বাংলা থেকে কাদিয়ানে হিজরতকারী প্রথম পরিবার। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী বুযূর্গ, যাঁর মরদেহকে বাংলাদেশ থেকে বেহেশ্‌তী মকবেরা রাবওয়াতে দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর অনুমতিক্রমে 'কিতায়ে খাস' (সংরক্ষিত অংশ)- এ দাফন করা হয়। ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতিহি মাঁইয়াশাউ)। তিনি একাই দীর্ঘদিন যাবৎ অবিভক্ত

বাংলায় মোবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের অনেক জামাতের গোড়াপত্তনই তাঁর দ্বারা ঘটে। আর এভাবেই বাংলাদেশের আহমদীয়তের তবলীগের ইতিহাসে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর জীবনী বাংলাদেশের আহমদীয়তের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'হাদীসুল মাহ্‌দী'র জন্য তিনি বাংলাদেশের আহমদীগণের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আমাকে মরহুমের জীবনী সংগ্রহ করতে যে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে তাতে আমি তীব্রভাবে অনুভব করেছি যে, বাংলাদেশের আহমদীয়তের ইতিহাস একত্র করা এ সময়ে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। আহমদীয়তের প্রাথমিক কালের বুযূর্গগণ যাঁদের উল্লেখ মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের জীবন-স্মৃতির বিভিন্ন জায়গাতে এসেছে তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনী আমাদের যুবকদের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশের আহমদীয়তের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বাগ্রে যাঁদের নাম স্মৃতিপটে নক্ষত্রের মত মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে তাঁরা হলেন হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, মোকাররম মোহতারম প্রফেসর আব্দুল লতীফ সাহেব, মোকাররম খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব, মোবাল্লেগ ইংল্যান্ড ও জার্মান, মোকাররম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব। এ চারজন বুযূর্গ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন সময়ে আমীরও ছিলেন। জামাতের ভিত্তিকে সঠিকভাবে সাজানোর ব্যাপারে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁদের জীবনী নতুন প্রজন্মের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

উপরোল্লিখিত মণীষীগণ এবং আরও অনেক اَلسَّابِقُوْنَ الاَوَّلُوْنَ "আস্ সাবেকুনাল আওয়ালুন" (প্রথম সারির) বুযূর্গ আহমদীগণের জীবনী যেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল মনে হয় সেভাবে হয় নি। বাংলাদেশে এখনো যাঁরা জীবিত আছেন তাদের স্মৃতির সহায়তায় ঐ সমস্ত মনীষীগণের জীবনেতিহাস এখনো লিপিবদ্ধ করা গেলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এ সমস্ত মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনেতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে আলোকিত এবং তাদের পূর্বসূরীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। অনেক বিলম্বে হলেও আমি এ দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি এ ভেবে যে, অন্তত আমার পিতার স্মৃতি যেটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে তা লিপিবদ্ধ করে যাই।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের পরিপূর্ণ জীবনী লেখারই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে নি। এর প্রধান অন্তরায় হলো সময়। যে সময়ে এ কাজে হাত দিয়েছি তখন মাওলানা সাহেবের সঙ্গী-সাথীগণ প্রায় সকলেই প্রয়াত: হয়েছেন। আর গুটিকয়েক রয়ে গেছেন যাঁদের এখন খুঁজে বের করতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, আমার জীবদ্দশাতেই আমার মরহুম পিতা ইতিহাস হয়ে গেছেন। স্বভাবতই এ সমস্ত কারণে এ লেখাকে পরিপূর্ণ জীবনী না বলে জীবন-স্মৃতি বলাই শ্রেয়।

এ জীবন-স্মৃতি শুধু মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের জীবন-স্মৃতিই নয়, এখানে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বুযূর্গদের জীবনেরও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে যা বাংলাদেশে আহমদীয়তের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে।

এ জীবন-স্মৃতি রচনায় আমাকে বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছে তখনকার আহমদী পত্র-পত্রিকা যা সদর আঞ্জুমান কাদিয়ান এবং রাবওয়ায় সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের যেসব বুযূর্গ এখনো জীবিত আছেন যাঁরা মাওলানার সাহচর্য পেয়েছেন তাঁদের সাক্ষাৎকার এ রচনাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা আমি বলতে চাই, বাংলা ভাষায় আমার ভাল দখল না থাকায় আমি প্রথমে এ বইটি উর্দূতে রচনা করি। আমার বড় ছেলে আজিজুর রহমান (ওয়াকাস) অসীম ধৈর্য ও দিনরাত কঠোর পরিশ্রমের সাথে উর্দূ কম্পিউটার কম্পোজ করে আমার এ লেখা পূর্ণতাকে দিয়েছে। তারপর বাংলায় সরল অনুবাদ করেছেন আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। এর অনুলিখন করেছেন আমার ছোট ভাই হামীদুর রহমান। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ব্যবস্থাপনায় ও সমন্বয়ে আমার ছোট বোন সাদেকার বড় ছেলে মোহাম্মদ আহমদ তপুর বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলায় কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণের কাজে আমার বড় ভাই আতাউর রহমানের ছোট ছেলে রিয়াজ ও আমার ছোট ভাই হামিদের ছেলে মুহিত ও তৌহীদ-এর অবদান রয়েছে। মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর তারেক সাইফুল ইসলাম সাহেব, নারায়ণগঞ্জের আনোয়ার আলী সাহেব, মোল্লা ফজলুল করিম সাহেব এবং প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ পুস্তককে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের সবার আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রমের জন্য তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলা এঁদের সকলকে ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম পুরস্কারে ভুষিত করুন, আমীন

পিতার ঋণ কখনো শোধ করা যায় না। আমার পিতা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমাদেরকে কাদিয়ানের পুণ্যময় পরিবেশে রেখে পড়াশুনা করার এবং তরবিয়ত পাওয়ার এক অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেজন্য পাঠকের কাছে আমার মাতা-পিতার জন্য দোয়ার আবেদন করছি। মহান আল্লাহ্‌তাআলা যেন আমার পিতা-মাতার আত্মত্যাগ গ্রহণ করেন আর জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মকাম দান করেন এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মে আহমদীয়তের কল্যাণ যেন চিরস্থায়ী হয়।

বিনীত

দোয়া প্রার্থী

মুজীব-উর-রহমান

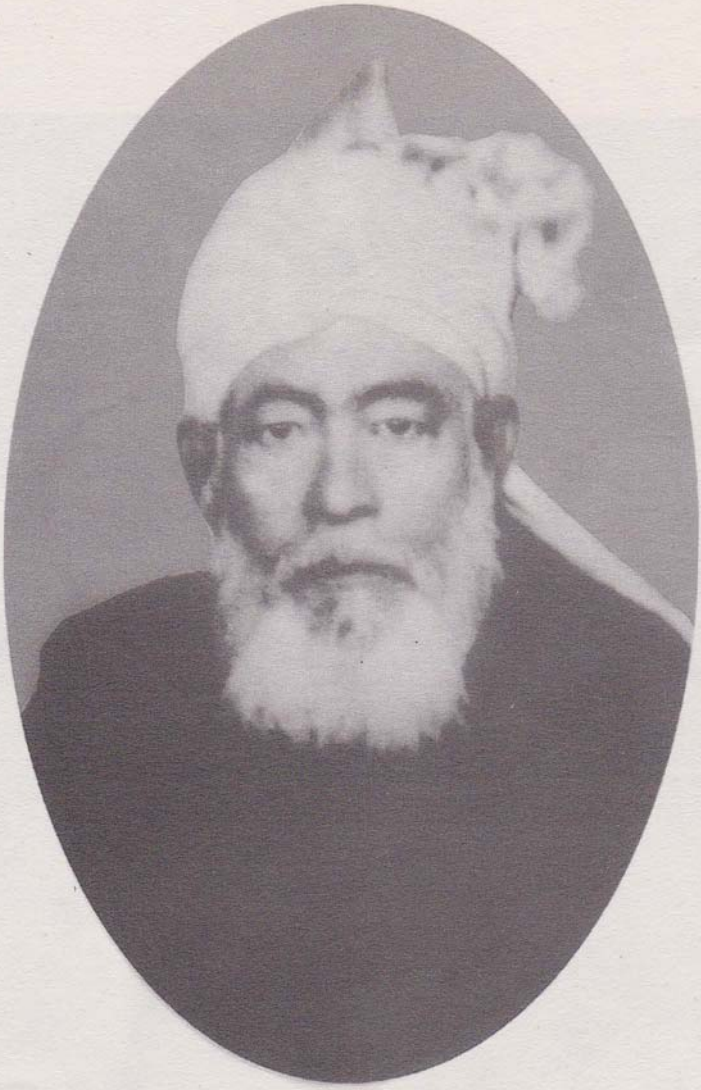

আল্লামা জিল্লুর রাহমান (১৮৯৫-১৯৬৪ইং)

আল্লামা জিল্লুর রাহমান (১৯৩৯ ইং সনের ছবি)

"আপনার লেখার মধ্যে সাধুতা ও সৌভাগ্যের সুগন্ধ অনুভব করছি"২-এ বাক্যটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী হযরত মৌলভী সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ:) সম্বন্ধে লিখেছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী তথা আহ্বান তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমে সকল প্রান্তেই পৌছে গিয়েছিল। অবিভক্ত বাংলায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তত দু'জন সাহাবী ও একজন সাহাবীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন হযরত আহমদ কবীর নূর মুহাম্মদ (রাঃ), হযরত রইছ উদ্দিন খান সাহেব এবং রইছ উদ্দিন খান সাহেবের বেগম সাহেবা (রা:)।

জনাব আহমদ কবীর নূর মুহাম্মদ সাহেব চট্টগ্রামের আনওয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী নিবাসী। তিনি কাদিয়ানে পৌছানোর পর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত হয়ে নিজ আবাস ভূমি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী জনাব রইছুদ্দীন খান সাহেব বার্মার মাগুটি এলাকায় পোষ্ট মাষ্টার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। উর্দূ পত্র-পত্রিকা পড়া তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি এক সময় কাদিয়ান সফর করেন এবং সেখানে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত হন। হযরত রইছ উদ্দীন খান সাহেব মারফত তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা বয়াত হন। ১৯২১ সনে আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং নিজ গ্রাম নাগেরগাঁওতে সমাধিস্থ হন।

প্রথম খেলাফতের যুগে বগুড়ার মৌলভী খান সাহেব মোবারক আলী সাহেব, যিনি চট্টগ্রামে স্কুল শিক্ষক ছিলেন, ১৯১৩ সনে ডিসেম্বর মাসে দীনি শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কাদিয়ান যান এবং বয়াত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রা:)-এর মৃত্যুর সময় তিনি কাদিয়ান ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খেলাফতের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

যদিও বাংলাদেশে আহমদীয়তের সূচনা অনেক পূর্বেই হয়েছিল কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আহমদীয়ত সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ:) সাহেব কতৃর্ক বিস্তার লাভ করে। হযরত মৌলভী সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব নিজ এলাকার এক অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন। তিনি সৈয়্যদ বংশীয় ছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষা লক্ষ্ণৌ হতে অর্জন করেছিলেন। তিনি মৌলভী আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল-এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে তিনি হেড মুদার্‌রেস ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কাযীও ছিলেন। তিনি যে মহল্লায় বাস করতেন তাঁর নামানুসারে সে মহল্লার নাম আজও

মৌলভীপাড়া হিসেবে খ্যাত। তাঁর বদৌলতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অবিভক্ত বাংলায় আহমদীয়তের প্রথম কেন্দ্র হবার সৌভাগ্য অর্জন করে।

মাওলানা সাহেব তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত পুস্তক 'জযবাতুল হক' -এ লিখেন, 'একদিন হঠাৎ হযরত সাহেবের (মসীহ মাওউদ- আঃ) এক লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে লাগলাম। লেখার মধ্যে এমন এক মর্যাদা ও প্রতাপ প্রকাশ পাচ্ছিল যে, পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হলো চোখ যেন আলোকিত হয়ে গেল। চোখ কচ্‌লিয়ে আবার পড়তে লাগলাম আবার পূর্বের অবস্থার সৃষ্টি হলো। আমি আবার চোখ কচ্‌লিয়ে পড়তে শুরু করলাম আবারও পূর্বের অবস্থার পুনরাবৃত্তি হলো। তখন আমি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতে শুরু করলাম। মনে হলো, এ লেখার মধ্যে জ্যোতিঃ আছে। আমি মনে মনে বললাম, মিথ্যাবাদীদের অনেক লেখাইতো পড়েছি কিন্তু কখনও এ অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। মিথ্যাবাদীদের লেখাতো অন্ধকারে পূর্ণ থাকে। তাহলে এ লেখাতে এত জ্যোতিঃ কেন? এরপর আমার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আরও পুস্তক পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো।'[৩]

তিনি আরও লিখেন, "প্রথম প্রথম যখন বই পড়তাম আর এর মধ্যে কোন বিষয়ে যদি মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতো সাথে সাথে এর খন্ডন করে লিখতে শুরু করতাম। কিন্তু যখন নিজের লেখা দ্বিতীয়বার পড়তাম তো মনে হতো আমার লেখাতো কিছুই হয় নি, আর তা ছিঁড়ে ফেলতাম। এভাবে অনেক কাগজের পাতা নষ্ট হয়েছে, অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং সন্দেহের খন্ডন করা হতে বিরত হই। অতঃপর হযরত সাহেবের সমর্থনে যখন মনকে প্রস্তুত করি তখন মনে অসাধারণ শক্তি অনুভব করলাম। এরপর হযরত সাহেবের সাথে সরাসরি রীতিমত পত্রালাপ করতে লাগলাম। নিজ সন্দেহের উত্তর স্বয়ং হযরত সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম। সুতরাং আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর হযরত সাহেব কর্তৃক প্রণীত বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খন্ডে ছাপা হয়েছে।"[৪]

এ চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সম্বন্ধে এই বলে এক চিরস্থায়ী সনদ প্রদান করে গেছেন, "আপনার লেখার মধ্যে সাধুতা ও সৌভাগ্যের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।" এবং এ লেখা সৌভাগ্যবান ও সত্যপিপাসু বলে প্রতীয়মান হয়।"

মৌলভী সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ সালে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সঙ্গী সাথে নিয়ে কাদিয়ান গমন করেন।

পাঠকবৃন্দ! তাঁর এ চিত্তাকর্ষক সফরের অভিজ্ঞতা শিক্ষামূলক ঘটনাসমূহ জানতে হলে তাঁর লেখা "জযবাতুল হক" পাঠ করতে পারেন। কাদিয়ান পৌঁছে তিনি সেখানে দু'সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং পরিশেষে ১৯১২ সালের পহেলা নভেম্বর, জুমুআর নামাযের পর তিন সফরসঙ্গী সহ হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়ালের (রা:) হাতে বয়াত করে সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ায় প্রবেশ করেন। খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রা:) তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে 'দস্তি 'বয়াত গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

পুণ্য ও সৌভাগ্যের যে ঘ্রাণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অনুভব করেছিলেন তা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপদকে মোহিত করে তুলে। কেননা, তিনি যখন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তাঁর সাথে ছিল সুগন্ধি বসন্তের এক অপূর্ব প্রবাহ!

কাসাইট গ্রামের দুই কৃতি সন্তান

আল্লামা জিল্লুর রাহমান

সুফি মতিউর রহমান

কাসাইট গ্রামের দুই কৃতী সন্তান

কাসাইট ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পূর্বদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এ গ্রামের ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব একজন কোকিলকণ্ঠি ক্বারী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণদানকারী (ওয়ায়েয) ছিলেন। মাওলানা রুমীর মসনভী থেকে ওয়ায করতেন। তিনি নিজ সুমিষ্ট সুরের মুর্ছনা-পূর্ণ কণ্ঠে উচ্চস্বরে মস্‌নবীর পংক্তি পাঠ করতেন ও ওয়ায করতেন। তার সম্বন্ধে আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব বর্ণনা করেন, ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব মোহতরম মুন্‌শী জাহান বখ্‌শ এবং তাঁর পিতা মোকাররম আওসাফ আলী উকিলের কাছে আসা-যাওয়া করতেন। তাঁর অল্প বয়সে মতিন চৌধুরী সাহেব ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের কণ্ঠ শুনার সুযোগ হয়েছিল। আর এখন আশি বছর বয়সেও তিনি ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের সেই জাদুকরী কণ্ঠধ্বনি অনুভব করেন- যেন আগের মতই কানে বাজে।

ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের ঘরে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ছিল। ফার্সী ভাষার খুব চর্চা হতো। ছেলেরা ফার্সী অথবা আরবী ভাষা আনুষ্ঠানিক ভাবে শিখেন নি। তবুও তারা অবসরে ফার্সি ভাষার পংক্তি অথবা কবিতা আওড়াতো। এটা ঘরোয়া পরিবেশে ফার্সী ভাষা চর্চার দরুনই সম্ভব হয়েছিল। ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের চার ছেলে। তাঁরা হলেন, যথাক্রমে বজলুর রহমান সাহেব, জিল্লুর রাহমান সাহেব, মতিউর রহমান সাহেব ও মাহবুবুর রহমান সাহেব। কুরআন শরীফের প্রতি এ পারিবারের প্রাকৃতিগতভাবেই চর্চা ও আকর্ষণ ছিল এবং ফার্সী যেন বংশের ভাষা ছিল। ক্বারী সাহেব তাঁর সন্তানদেরকে নেক তরবিয়তে গড়ে তুলে ছিলেন। বজলুর রহমান সাহেবকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন এবং তিনি সরকারী চাকুরী করতেন। জিল্লুর রহমান সাহেব ঢাকা মাদ্রাসা আলীয়া হতে শিক্ষা অর্জন করে ঘরে ফিরেছিলেন। সম্ভবত ক্বারী সাহেবের তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করার ইচ্ছা ছিলো, যা পরবর্তীতে মহান আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ হয়েছিল। মতিউর রহমান সাহেব আই এ পড়তেন আর মাহবুবুর রহমান সাহেব তখন স্কুলের ছাত্র।

সে সময় হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব দেওয়ানার মত দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে গোটা এলাকার মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আর অপরদিকে হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ধর্মীয় জ্ঞানের খ্যাতি ও সত্যের পয়গাম আলোকিত হৃদয়সমুহকে জয় করতে লাগলো। এর ফলে চতুষ্পার্শ্বের কোন গ্রামই আহমদীয়তের সুশীতল

বাতাস থেকে বঞ্চিত রইল না। লোকেরা দলেদলে আহমদীয়তের ছায়াতলে আসতে শুরু করলো। সে দিনগুলোতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার চতুর্দিকে অনেক শিক্ষিত যুবক আহমদীয়ত গ্রহণ করছিল। চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন বাঙ্গালী, গোলাম সামদানি উকিল ও দৌলত আহমদ খাদেমের মত যুবক যেন নক্ষত্ররাজির মত আহমদীয়তের আকাশে একের পর এক উদিত হতে লাগলো।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ঢাকা গভর্নমেন্ট সিনিওর মাদ্রাসা হতে আরবীতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সাথে হাফেয রওশান আলী সাহেব (রা:) তবলিগী সফরের এক পর্যায় নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্য ঢাকা আসেন। নওয়াব সাহেব অসুস্থ থাকায় ফিরে আসেন। পর দিন তারা ঢাকা গভর্নমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসায় (যা এখন আলীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত) পরিদর্শনে যান। তথায় মাদ্রাসার মোদাররেসগণের সাথে দীর্ঘ তবলিগী আলোচনা হয়। এ আলোচনার সময় জিল্লুর রাহমান সাহেবও উপস্থিত ছিলেন এবং এখানেই তিনি আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন। জিল্লুর রহমান সাহেব তখন মাদ্রাসার ছাত্র। পরবর্তীতে কোন এক সাক্ষাতে তিনি আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। এর পরের ইতিহাস মাওলানার জীবনের ত্যাগ, তিতিক্ষা, অধ্যবসায়, এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে উৎসর্গ করার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের তবলীগের ফলে ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের দুই ছেলে হৃদয়ের গহীন হতে আহমদীয়তের নূরে আকৃষ্ট হয়ে আহমদীয়তের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে বয়াত গ্রহণকারী যে একশ' ব্যক্তির তালিকা আল্ ফযলের ১৩ই অক্টোবর, ১৯১৬ সনের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাতে পঁচাত্তরতম নাম মতিউর রহমান এবং শততম মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেবের নাম লিপিবদ্ধ আছে। ক্বারী নাঈমউদ্দিন সাহেবের এ দু'পুত্রের মাঝে মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেব ছিলেন বড় ও মতিউর রহমান সাহেব ছোট। মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেব বয়াত গ্রহণের সময় সম্ভবত ঢাকা মাদ্রাসা হতে পাশ করে এসেছিলেন আর মতিউর রহমান সাহেব আইএ পড়তেন।

দু'পুত্রের আহমদী হয়ে যাওয়াতে ধর্মভীরু জ্ঞান-পিপাসু এলাকায় নেত্রী স্থানীয় পিতা ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে দীর্ঘ বহস হতো। অনেক সময় সত্যান্বেষী পুত্রের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের

সামনে ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব যখন নিরুত্তর হয়ে যেতেন এবং ক্ষোভে দু:খে তখন তিনি মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেবকে মারতে উদ্যত হতেন। তখন তাঁর মা প্রতিবাদ করতেন এবং বলতেন, ছেলে আলেম হয়েছে তার কথা মনে দাগ কাটে। তার কথার উত্তর দিন। উত্তর দিতে পারেন না সে অন্য কথা, তাকে মারবেন কেন? ঘরোয়া পরিবেশের এ ধর্মীয় তর্ক ও বহস এবং মার বাধা দেয়া বেশি দিন দাদার ক্রোধ হতে তাদের বাঁচাতে পারে নি। ঘরে তো বিরোধিতা ছিলই তদুপরি তাদের গ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার চতুষ্পার্শ্বে বিরোধিতা তীব্র রূপ শুরু হলো। ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের মুরিদানদের মধ্যেও প্রবল বিরোধিতা শুরু হলো। অবশেষে পিতা ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব পুত্রদ্বয়কে বাড়ি ছাড়া করলেন। বিরোধিতার ঝড় যে শুধু তাদেরকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করলো তাই নয় বরং দেশও ছাড়তে হলো। ভরা বর্ষায় জিল্লুর রাহমান ও মতিউর রহমান সাহেবের জীবনতরী ভাসলো জীবন সাগরে। যে জীবনতরীর কর্ণধার বিধাতা, সে তরী তার অভিষ্ট লক্ষ্যে একদিন পৌঁছে গেলো। নিজ দেশের মাটিকে বাঙ্গালী গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু আহমদীয়তের ভালবাসা ও প্রেমের টান এত তীব্র ও গভীর ছিল যে, এর বিপরীতে দেশ, মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজনদের ভালবাসা ম্লান হয়ে গেল। দু'ভাই হিজরত করে ও আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ (ওয়াকফে যিন্দেগী) করে কাদিয়ান চলে গেলেন।

এ যুবকদের মাতৃভূমি ছেড়ে দিয়ে এক অচেনা দেশের দিকে হিজরত করার দৃশ্য কল্পনা করলে অভিভূত হতে হয় এবং মনে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে। সে যুগে চলাফেরার সুবিধাদি তেমন ছিল না এবং ভ্রমণও বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে বাটালা পর্যন্ত পৌঁছাতে ট্রেনে তিন চার দিন লাগতো। কিন্তু এক সত্যের হাতছানিতে এ সত্যান্বেষী যুবকদ্বয়ের কাছে সব রকমের বাধা-বিঘ্ন বিপদ-আপদ বাষ্পের ন্যায় নীলিমায় বিলীন হয়ে গেল এবং সমস্ত প্রতিকুলতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে শান্তির নীড় "দারুল আমান" কাদিয়ানে পৌঁছে গেলেন। আলোর অমোঘ আকর্ষণ বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লীর দুই যুবককে পতঙ্গের মত পাদ-প্রদীপে টেনে নিল।

আল্লাহ্‌র পথে হিজরত

জিল্লুর রাহমান সাহেব ও তাঁর ছোট ভাই সুফী মতিউর রহমান সাহেব আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে কাদিয়ান চলে গেলেন এবং কাদিয়ানের আত্মা-সঞ্জীবনী পরিবেশে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপন মাতৃভূমি কাসাইটে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন নি।

১৯১৬ বা ১৯১৭ সালে হিজরত করে যখন তারা কাদিয়ান আসেন তা ছিল খেলাফতে সানীয়ার প্রাথমিক যুগ। জামাতে আহমদীয়া তখন সবেমাত্র এক বড় ভূমিকম্প হতে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) তখন অল্প বয়সের যুবক। জামাতে আহমদীয়ার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি মনে করলেন, এ অল্প-বয়সী যুবকের নেতৃত্বে জামাতে আহমদীয়ার কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তারা নিজেদের জ্ঞানের অহংকারের বোঝা মাথায় নিয়ে কাদিয়ান ছেড়ে লাহোরে চলে যান। সেখানে বসে সে সকল লোক নিজেদের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে খেলাফতে সানীয়ার যুবক খলীফাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ, প্রসার এবং সফল হতে দেখছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ যুবক বয়সে একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ সংগঠক ও জেনারেলরূপে জামাতকে সুংসহত করছিলেন। কাদিয়ানে যেন স্থায়ীভাবে বসন্তের আবির্ভাব হলো। চতুর্দিকে যেন সুশোভিত ফুল আর ফুল শোভা পাচ্ছিল। চারিদিকে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ বক্তৃতা ও খুতবাগুলো জামাতের মধ্যে এক নূতন প্রাণ সঞ্চার করছিল। কাদিয়ান জ্ঞান ও আশীষের এমন এক গ্রামে পরিণত হলো যার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই সেই গ্রাম, যেখানে কোন রেল পথ ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না, টেলিগ্রাম অফিস পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু সেই গ্রামের জ্ঞান চর্চার বিস্তৃতি এবং আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল সত্যান্বেষী মানুষকে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য ও আলোকিত করার জন্য গভীরভাবে আকর্ষণ করতে লাগলো।

সে সময় কাদিয়ানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এমন সব সাহাবা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরা যেন যুগ-ইমামের চলমান ছবি। তাঁদের পবিত্র জীবনের আদর্শ-নমুনা এবং সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে মোবারক ও মসজিদে আকসায় আলাপ চারিতায় অংশগ্রহণকারীদের মন-মেজাযকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যক্তিত্বের সুগন্ধিতে মাতিয়ে রাখতো। সেটা ছিল এক মনোরম, স্নিগ্ধ, হৃদয় আলোকিত করার পরিবেশ। সেখানে বাংলার এক নিভৃত পল্লীর দু' যুবক হিজরত করে গিয়েছিল। কোথা থেকে কোথায় পৌঁছাল, যেন মাটি থেকে আকাশে। যেন

বাংলার নিভৃত পল্লীর পায়রা কাদিয়ানের আকাশে আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টি ও শান্তির নীড় খুঁজে পেলো।

১৯১৭ সালে যখন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর তাহরিক হয় মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করেন এবং আহমদীয়াতের ইতিহাসে প্রাথমিক ওয়াকেফিনে জিন্দেগীর অন্তরভুক্ত হয়ে যান। হযরত হাফেয রওশান আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় তার মোবাল্লেগ প্রশিক্ষণ।

দীর্ঘ মোবাল্লেগ প্রশিক্ষণ কালের মধ্যে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব একবার বাংলাদেশে আসেন এবং বিয়ে করেন। কিছুদিন বাংলাদেশ অবস্থান করে পরিবার রেখে পুনরায় প্রশিক্ষণ শেষ করার জন্য কাদিয়ান চলে যান। আবার যখন মোবাল্লেগ হিসাবে বাংলায় প্রেরিত তখন ছোট বাচ্চাদেরসহ স্ত্রীকে কাদিয়ান পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁর ভবিষ্যত বংশধর আহমদীয়তের সঠিক শিক্ষায় মানুষ হয়। পক্ষান্তরে তিনি বেছে নিলেন নিজ দেশে পরবাসীর মত আজীবন মুসাফিরী জীবন।

ভারত বিভক্তির কিছু দিন পূর্বে তিনি কাদিয়ানে বসত বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। দেশ বিভক্তির পর আবার পাকিস্তানে হিজরত করেন। অবস্থা শান্ত হলে পরিবারকে রাবওয়া রেখে নিজে আবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনোবাসনা ছিল যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি যেন আহমদীয়তের কেন্দ্রের পরিবেশে লালিত-পালিত হয় এবং এ জন্যে নিজেকে পরিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত রেখেছেন আজীবন। সালানা জলসার দিনগুলোতে কিছুদিনের জন্য কাদিয়ান যেতেন। এভাবে তিনি ও তাঁর পরিবার-পরিজন পরস্পরে একে অন্যকে শুধু কয়েকদিন বা মাস খানেকের জন্য কাছে পেতেন। সন্তানদের নিজের হাতে লালন-পালন, তাদের হামাগুঁড়ি দেয়া, হাঁটা শুরু করা, বাচ্চাদের আধো আধো বোল এ সমস্ত ছোট ছোট খুশি-আনন্দ তিনি কখনও প্রাণ ভরে উপভোগ করার সুযোগ পান নি। এভাবে মাওলানার সারাটা জীবনই এক প্রকার হিজরতের মধ্যে কেটেছে। তাঁর হিজরত শুধু স্থানের পরিবর্তন ছিলো না বরং ছিলো হিজরত ইলাল্লাহ-আল্লাহ্ বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হিযরত।

বিগলিত চিত্তের স্মরণীয় ও বরণীয় দোয়া

জিল্লুর রাহমান সাহেবের হৃদয় একদিকে যেমন কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক সম্পদ গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছিলো ঠিক অন্যদিকে তাঁর হৃদয় বড়ই বিচলিত ছিলো। দুঃখ অসহনীয় হয়ে উঠছিল এই ভেবে যে, হায়! আমার পিতা তো এ অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। তিনি পিতার নেকী ও দীনদারী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। জ্ঞানের গর্বের পর্দা তাঁর পিতার আহমদীয়ত গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যুগ-ইমামকে চিনতে না পেরে জাহেলিয়তের মৃত্যুর দিকে ধেয়ে চলছিলেন। এ দুঃখ মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবকে প্রতিনিয়ত ঘূণ পোকার মত কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। তিনি বিচলিত চিত্তে পিতার হেদায়াতের জন্য ব্যাকুলভাবে দোয়া করতে লাগলেন।

বুযূর্গগণকেও দোয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতেন। নিজ পিতার হেদায়াতের জন্য এ বিচলতা তাঁর হৃদয়ে যে তীব্র দহনের সৃষ্টি করেছিলো তা এক আর্তনাদে পর্যবসিত হয়ে দোয়ার কবুলিয়তের এক অনন্য ইতিহাস হয়ে আছে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা তার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে এবং মনের গভীরে রেখাপাত করে। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের পিতার আহমদীয়ত গ্রহণ এমন একটি ঘটনা যা তিনজন বুযূর্গ ব্যক্তিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিলো এবং তা সেই তিনজনের প্রত্যেকের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন জাষ্টিস শেখ বশীর আহমদ সাহেব বলেন, ১৯২০ বা ১৯২১ সনের কথা, আমি মৌলভী আব্দুস সালাম উমর সাহেবের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য কাদিয়ান হতে কলকাতা যাত্রা করি। এ সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব, হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব, হাদী আলী খান সাহেব (পিতা হযরত মৌলভী যুলফিকার আলী গওহার সাহেব) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ)-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ। এ যাত্রায় কোন এক ভ্রমণ সঙ্গীর অনুরোধে হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব বিগলিত চিত্তে দোয়া করার এমন দু'টি ঘটনা শুনালেন যা তাঁদের সবার জীবনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল ঃ

১) মরহুম হযরত হাফেয সাহেব বললেন, "প্রাথমিক যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ পংক্তিটি যখন পড়লাম پیشہ ہے رونا ہمارا پیش ربّ ذوالمنن

"পেশা হে রোনা হামারা পেশ রব্বে যুলমিনান (অর্থাৎ আমাদের একমাত্র কাজ হলো অনুগ্রহকারী খোদার নিকট কান্নাকাটি করা) তখন মনে এ ধারণার উদয় হলো, দেখিতো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কীভাবে নিজ প্রভুর সামনে কান্নাকাটি ও আর্তনাদ করেন। এক রাতে মরহুম হযরত হাফেয সাহেব তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠলেন এবং চুপিসারে সে কক্ষের দিকে গেলেন যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) রাত্রি যাপন করতেন। দরজার নিকটে পৌছালেন তো হৃদয় নিংড়ানো কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হলো যেন একটি জবাইকৃত বকরী ছটফট করছে। তিনি দরজায় কান লাগিয়ে শুনলেন ও চিনতে পারলেন যে, এটা তো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর।

২) বিগলিত চিত্তে কান্নাকাটি করার দ্বিতীয় ঘটনাটি হযরত হাফেয সাহেব তাঁর এক সৌভাগ্যবান ছাত্রের বলে বর্ণনা করেন। মরহুম হযরত হাফেয সাহেব মুবাল্লেগ ক্লাসের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হযরত হাফেয সাহেবের সাথে তাঁর ছাত্রদের স্নেহময় পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল। হযরত হাফেয সাহেব বর্ণনা করেন, একদিন তিনি পড়িয়ে বাসায় ফিরছিলেন (ঐ দিনগুলোতে হযরত হাফেয সাহেব মসজিদে মুবারকের নিকট হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী সাহেবের দোতালায় থাকতেন)। তিনি যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন, সে সময় মৌলভী জিল্লুর রাহমান বাঙ্গালী তাকে "হাফেয সাহেব" বলে ডাক দেন। হযরত হাফেয সাহেব মনে করলেন, হয়ত বৃত্তি না পাবার দরুন টাকার প্রয়োজন পড়েছে। সুতরাং হাফেয সাহেব উত্তরে বল্‌লেন, "জিল্লুর রহমান কী ব্যাপার তোমার কি টাকা-পয়সার প্রয়োজন"? মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেব অগ্রসর হয়ে হযরত হাফেয সাহেবের হাত ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি এমনভাবে ডুকরিয়ে কাঁদছিলেন যে, হযরত হাফেয সাহেব ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জিল্লুর রাহমান কাঁদছো কেন? উত্তরে তিনি অত্যন্ত বেদনাতুর স্বরে বল্‌লেন, হাফেয সাহেব আমার পিতা নিজ এলাকার পীর। লোকেরা তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করে। অসংখ্য লোক তাঁর মুরীদ। আমি তাঁকে অনেক তবলীগ করেছি কিন্তু আমার তবলীগ তাঁর উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করছে না। মৌলভী সাহেব অঝোরে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, আমার পিতা কি যুগ-ইমামকে না চিনে জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করবেন? আপনি আমার পিতার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্‌তাআলা যেন আমার পিতাকে হেদায়াত দান করেন।

হযরত হাফেয সাহেব বর্ণনা করেন, তাঁর কান্নাকাটি ও হৃদয়ের আকুতি আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করলো যে, আমি তাৎক্ষণিকভাবে অঙ্গীকার করলাম যে, তাঁর পিতার জন্য অবশ্যই দোয়া করবো।

এরপর হযরত হাফেয সাহেবের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন নামায পড়তেন মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেবের করুণ চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতো। দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন তো মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেবের আকুতি মনে পড়ে যেত। সুতরাং হাফেয সাহেব ক্রমাগত মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেবের পিতার জন্যে দোয়া করতে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী, যিনি তখন শিমলাতে ছিলেন, হযরত হাফেয সাহেবকে ডেকে পাঠান। হযরত হাফেয সাহেব হুযূরের নির্দেশ পালন করতঃ শিমলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সফরে ক্রমাগতভাবে মৌলভী জিল্লুর রাহমান-এর কান্নাকাটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো এবং তিনি ক্রমাগতভাবে দোয়া করতে থাকেন। হযরত হাফেয সাহেব শিমলায় পৌছান এবং হুযূরের খেদমতে জিল্লুর রাহমান সাহেবের পিতার জন্য দোয়ার আরয করলেন। কয়েকদিনই মাত্র গত হয়েছিল, একদিন সকাল বেলায় হুযূর দ্রুত গতিতে কামরা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং বল্‌লেন হাফেয সাহেব মোবারকবাদ! মৌলভী জিল্লুর রাহমানের পিতার টেলিগ্রাম এসেছে, তিনি বয়াত গ্রহণের দরখাস্ত করেছেন।

এ ঘটনা বলতে গিয়ে হযরত হাফেয সাহেব বর্ণনা করেন যে, কান্নাকাটি ও হৃদয় নিংড়ানো আকৃতির এ দু'টি ঘটনা আমার জীবনে এমনই প্রভাব ফেলেছে যে, যদি কখনো দোয়া করতেই চাই এবং দোয়ায় মন বসে না তখন উপরে বর্ণিত ঘটনা দু'টি মনে পড়ে যায় আর তখনই দোয়ার দিকে আমার মন বসে যায়।

এ ধরনের ঘটনা সে সমস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি যা আহমদীয়ত আমাদের কাছ থেকে চায়। হাফেয সাহেবের জীবনে সে ঘটনাটি তো স্মরণীয় ছিলই অপরদিকে সফরের সময়ে এ ছোট্ট ঘটনা শ্রোতাদের উপর কী প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো, তার অনুমান এর দ্বারা করা যেতে পারে যে, শেখ বশির সাহেব হযরত হাফেয সাহেবের মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরও এ ঘটনাকে স্মরণ রেখে তা আল্ ফুরকান পত্রিকায় 'রওশন আলী' স্বারক সংখ্যায় লিখে পাঠিয়েছিলেন।[৫] এটা যে শুধু হাফেয সাহেবের জন্য স্মরণীয় ছিল তা নয় বরং পাঠকদের জন্যও স্মরণীয় এবং অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

আহমদীয়তের সত্যতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস, দৃঢ় ঈমান, হৃদয় নিংড়ানো দোয়া, ব্যাকুলতা ও পিতার ঈমানের জন্যে হৃদয়ের প্রকৃত বেদনা ছিল জিল্লুর রাহমান সাহেবের জীবনের নির্যাস।

ক্বারী নাঈম উদ্দিন সাহেবের চার পুত্র

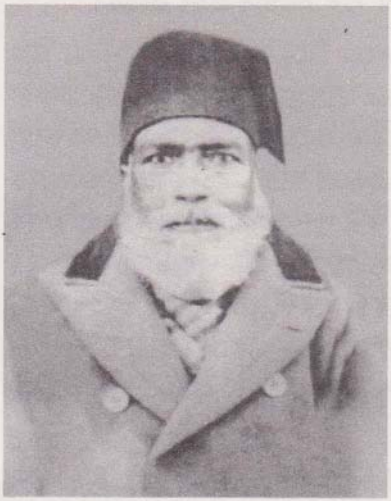

মৌলভী বজলুর রহমান

আল্লামা জিল্লুর রাহমান

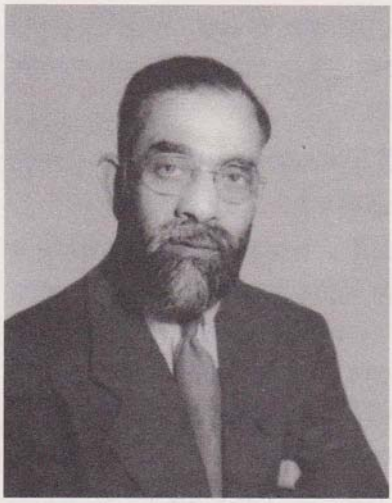

সুফি মতিউর রহমান

ডাঃ মাহবুবুর রহমান

ক্বারী নঈমউদ্দিন

পিতার হেদায়াতের জন্য পুত্রের হৃদয় নিংরানো কান্না, অনুগত এক ছাত্রের বেদনায় আপ্লুত এক মহান শিক্ষকের দোয়া এবং যুগ-খলীফার বিশেষ দোয়ার ফলশ্রুতিতে ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব ১৯১৭ সনে বয়আত গ্রহণ করেন।

প্রথম দিকে তিনি আহমদীয়তের যে প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিলেন তা ছিল তাঁর ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্ যখন ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবকে সত্য গ্রহণের তৌফীক দেন তিনি সেই অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস আমৃত্যু বজায় রেখেছেন। তিনি একজন ক্বারী এবং এলাকায় প্রতিষ্ঠিত পীর ছিলেন। আহমদীয়ত গ্রহণের কারণে তিনি পূর্বের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়েছেন । কিন্তু পূর্ববৎ দৃঢ়তায় অবিচল থেকেছেন নিজের ঈমানের উপর। এরপর ক্বারী সাহেব পুর্নোদ্যমে আহমদীয়তের তবলীগের কাজে লেগে যান। নিজ পরিবারের সকল সদস্যই তখন আহমদীয়তের ছায়াতলে। ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব জীবনের বাকী সময় বাংলাদেশে আহমদীয়তে তবিলীগের কাজেই নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন।

তিনি কখন কাদিয়ান গিয়েছিলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে ১৯২৩ সনে মার্চ মাসে তিনি কাদিয়ানে উপস্থিত ছিলেন। আহমদী হবার পর আল্লাহ্তাআলা তাঁর হৃদয়ের অর্গল খুলে দিয়েছিলেন। রূহানিয়তের আলো তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করছিল বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত এবং তা এক অনুকরণীয় নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল। 'আল্ ফযল' পত্রিকা ১৯২৩ সনে ১৫ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে-এর এক ঝলক পাওয়া যায়।[৬]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে', (আইঃ) সওয়ানেহ ফযলে উমর (ফযলে উমর (রাঃ)-এর জীবনী) নামক পুস্তকে এ উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন:

"১০ই মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আসরের নামাযের পর মসজিদে নূর এ আসন গ্রহণ করেন। ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেব বাঙ্গালী, যিনি একজন বয়স্ক বুযূর্গ, দাঁড়িয়ে কিছু বলার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি বাংলা ও উর্দূর সংমিশ্রণে এক উদ্যমপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ক্বারী সাহেব বললেন, কিছু কথা এমন রয়েছে যা ব্যক্তিগতভাবেও বলা চলে। কিন্তু সে কথাগুলো যদি জনসমক্ষে বলা হয় তাহলে অধিক ফলপ্রসূ হয়। এজন্যে জামাতের সামনে হুযূরকে কিছু আবেদন করতে চাই যদিও আমার ছেলে (মৌলভী) জিল্লুর রাহমান ও মতিউর রহমান (বি,এ ক্লাসের ছাত্র) এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলে নি। হুযূর গতকাল রাজপুতনায় শুদ্ধি আন্দলনের বিপক্ষে তবলীগ করার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করার

জন্য আপনি যে আহ্বান করেছেন এবং যে শর্তসমূহের সাথে সেখানে থাকতে বলেছেন, আমার অনুমান হতে পারে, তারা (পুত্রদ্বয়) মনে করছে নিজেদেরকে হুযূরের নিকট উৎসর্গ করলে বৃদ্ধ পিতার কষ্ট হবে। কিন্তু হুযুরের সামনে খোদার কসম খেয়ে বলছি, তাদের সেখানে (জীবন উৎসর্গ করে) যাওয়াতে এবং বৈরী পরিবেশে দু:খ-কষ্ট ভোগ করাতে আমি বিন্দু মাত্র কষ্ট পাবো না এবং মনক্ষুণ্নও হবো না। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, এ দু'জন খোদার রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেও আমি এক ফোটা অশ্রু ঝড়াবো না বরং খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করবো। শুধু সে দু'জনই নয় বরং আমার তৃতীয় পুত্র মাহবুবুর রহমানও যদি ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবুও আমি কোনই দুঃখ করবো না। মনে করা যেতে পারে যে, সন্তানের দু:খ-কষ্টতেও সন্তুষ্ট থাকা কোন বড় ব্যাপার নয়। কিছু লোকের এমন স্বভাব থাকে যে তারা, পরম আত্মীয়ের মৃত্যুতেও হাসতে থাকে। তদুপরি আমি এ কথাও বলছি, যদি আমিও খোদার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করি তাহলে সেটা হবে আমার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়।

আমি এটা জানি, লোক দেখানো যশ ও বাহাদুরী এমন কাজ যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্যে আমি হুযূরের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি। আমার জন্যে দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আমার হৃদয়কে লৌকিকতা ও অহংকার বিবর্জিত রাখেন যা ঈমানের জন্য বিষ-স্বরূপ। আল্লাহ্ যেন আমাকে নিষ্ঠা দান করেন। বাঙ্গালী হৃদয় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ হয় না, কিন্তু মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার পর আমাদের হৃদয় বলবান হয়েছে এবং ঈমান আমাদের দুর্বলতাকে দূর করে দিয়েছে। এজন্যে খোদার রাস্তায় যে কোন প্রকার কষ্টই আসুক না কেন আমরা ঘাবড়াবো না। আল্লাহ্র পথে আমরা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত আছি। খোদাতাআলা আমাদের তৌফীক দান করুন"। এ ভাষণ শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এবং অন্যান্য বন্ধুগণ 'জাযাকাল্লাহ্' বল্লেন।

প্রসঙ্গত উলেখ্য, ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের তৃতীয় ছেলে মাহবুবুর রহমান তখন কাদিয়ান ছিলেন। তিনি হোমিও প্র্যাকটিস করতেন। বেঙ্গল হোমিও হল নামে কাদিয়ানে তার ডিসপেনসারি ছিল। হোমিও ডাক্তারিতে তার বেশ প্রসার ও যশ ছিলো। মাহবুবুর রহমান সাহেব বাসুদেব গ্রামে ভুঞা পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। মাহবুবুর রহমান মুসী ছিলেন এবং তাঁকে কাদিয়ান বেহেশ্তি মাকবেরায় সমাহিত করা হয়।

ক্বারী নঈমউদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে বজলুর রহমান সাহেব বৃটিশ সরকারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনিও সেই সময় আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথম বিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে করেছিলেন। সেই ঘরে তার পাঁচ ছেলে এক মেয়ে । তারা সবাই পাকিস্তানে করাচি, ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে কর্মরত আছেন। তিনি প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর মসীহ্ মাওউদ(আ:)-এর একজন সাহাবী পীর ইফতেখার মোহাম্মদ সাহেবের নাতনীকে বিয়ে করেছিলেন। এই ঘরে তার চার মেয়ে। এই নগণ্য লেখক তার দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

বজলুর রহমান সাহেব চাকুরী উদ্দেশ্যে যেখানেই গিয়েছেন আহমদীয়তের তবলীগ করেছেন। আহমদিয়া গেজেট থেকে জানা যায় তিনি যখন কুমিল্লায় কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি কুমিল্লা জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কাদিয়ান ফিরে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাড়ি নির্মাণ করেন। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে হিজরত করেন। তিনিও মুসী ছিলেন। রাবওয়ায় বেহেশ্তি মাকবেরায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

খেলাফত জুবিলী (১৯৩৯ খৃঃ) উপলক্ষ্যে কাদিয়ানে উপস্থিত তদানিন্তন বঙ্গদেশ থেকে আগত আহমদীদের একটি গ্রুপ ফটো

বামদিক থেকে প্রথম সারিতে দাঁড়ানো ঃ ১। মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ২। জনাব সিদ্দিকুর রহমান খুরশীদ সাহেব ৩। জনাব মীর আঃ সাত্তার সাহেব ৪। জনাব জাফরী সাহেব ৫। জনাব আবুল হোসেন (রেজিষ্টার) সাহেব ৬। জনাব আসাব আলী চৌধুরী সাহেব (পুনিউট) ৭। বাশারুকের একজন আহমদী ৮। জনাব মাষ্টার রজব আলী মুন্সী (বাশারুক)

বামদিক থেকে দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো ঃ ১। হাফেয আবদুল কাইউম (চুনিউট) ২। ডাঃ মোহাম্মদ মূসা সাহেব ৩। জনাব সুজাত আলী সাহেব (ইন্সপেক্টর বায়তুলমাল) ৪। জনাব এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার সাহেব ৫। মৌলবী রহমত আলী সাহেব (বাশারুক) ৬। মৌলবী আহমদ আলী সাহেব (তারুয়া) ৭। জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (পুনিউট) ৮। জনাব আবদুর রহমান খাঁ বাঙালী (পুনিউট) ৯। চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দীন সাহেব (বাচ্চা কোলে), দেবগ্রাম ১০। জনাব হামদু মিয়া (বাসুদেব)

তৃতীয় সারিতে বাম দিক থেকে চেয়ারে উপবিষ্ট ঃ ১। সালাহ্উদ্দিন (দাড়ানো) পিতা জনাব আঃ রহমান খাঁ সাহেব ২। মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বি,এ, ৩। খান বাহাদুর আবুল হাশেম চৌধুরী সাহেব (আমীর, বঙ্গদেশ) ৪। ডাঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব [সাহাবী, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] ৫। শেঠ মোহাম্মদ সিদ্দীক বানী সাহেব (কলকাতা) ৬। মৌলানা যিল্লুর রহমান সাহেব ৭। মুজিবর রহমান, পিতা মৌলানা যিল্লুর রহমান সাহেব।

সামনের সারিতে উপবিষ্ট ঃ ১। রুকাইয়া বেগম, পিতা আবুল হোসেন (রেজিষ্টার) সাহেব ২। ঐ ছোট বোন ৩। আহমদ সাদেক মাহমুদ, পিতা মৌঃ এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার সাহেব ৪। আবদুর রব (বাশারুক) ৫। ও ৬। অপরিচিত ৭। আতাউর রহমান, পিতা মৌলানা যিল্লুর রহমান সাহেব ৮। মোহাম্মদ আশরাফ, পিতা আবুল হোসেন (রেজিষ্টার) সাহেব।

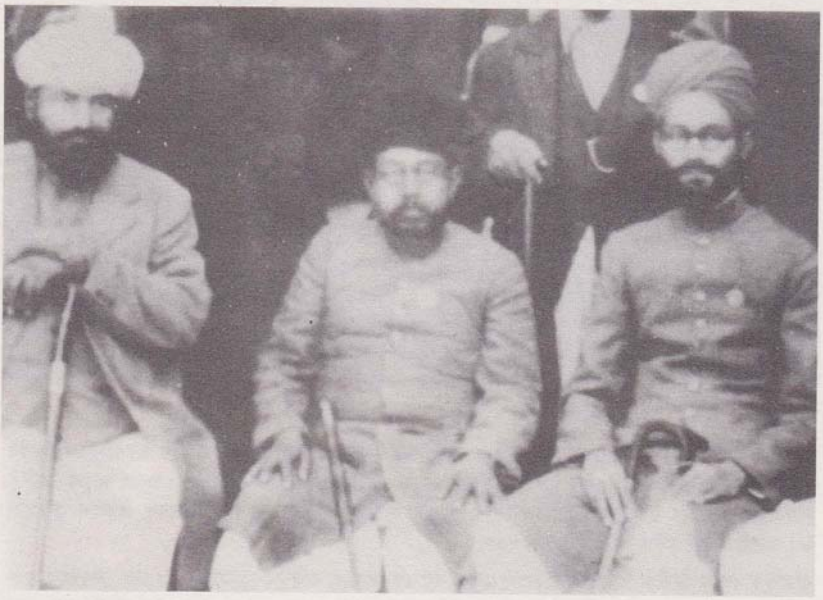

বাঁ-দিক থেকে ঃ হযরত মৌলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রাঃ), আল্লামা জিল্লুর রাহমান (মোবাল্লেগ বেঙ্গল ও মৌলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ (মোবাল্লেগ ইংল্যান্ড)

মহান শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরী

হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব এক বিখ্যাত সুফী বংশের সন্তান এবং তিনি জামাতে আহমদীয়ার একজন অদ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন । হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) বলতেন, "আমি আমার সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞান মিঞা মাহমুদ আহমদ (খলীফাতুল মসীহ সানী [রাঃ])-কে দিয়েছি এবং সকল বাহ্যিক জ্ঞান হাফেয রওশন আলীকে দিয়েছি।"[৭]

তিনি আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্ক ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী একজন আলেম ছিলেন। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ছাড়াও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। খৃষ্ট, ইহুদী, আর্য ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। তুলনামূলক ধর্মালোচনায় পারদর্শী এক অনলবর্ষী বক্তা ও সফল তর্কবাগীশ ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক ভারত-বিখ্যাত পন্ডিত শান্তিস্বরূপ, পন্ডিত প্রেমনাথ, পন্ডিত ধরম ভিক্ষু এবং পন্ডিত রাম চন্দ্রের সাথে সফল ধর্মীয় বিতর্ক করেছিলেন। আরবী ও উর্দূ ভাষার তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। এ'দুটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর সমকালীন আলেমগণ তাঁকে ভ্রাম্যমান ইনসাইক্লোপেডিয়া (জ্ঞানকোষ) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী সফরে গেলে হাফেয সাহেবকে সাথে নিয়ে যেতেন। কারও প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাঃ) বলতেন, "পুরো একটি লাইব্রেরী সাথে নেয়ার পরিবর্তে হাফেয সাহেবকে সঙ্গে নিলেই চলে"।

হাফেয সাহেব শুধু যে একজন সফল মুবাল্লেগ ছিলেন তা-ই নয়, বরং মুবাল্লেগ সৃষ্টিকারী এক অসাধারণ শিক্ষকও ছিলেন। তবলীগের মাঠে তিনি এক অভিজ্ঞ সফল জেনারেল। আহমদীয়া সিলসিলার সকল মুবাল্লেগই তাঁর জ্ঞানের স্রোতস্বীণি হতে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। হাফেয সাহেব নিজ ছাত্রদের সর্বদা তবলীগ করতে নসীহত করতেন এবং মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বেও উপস্থিত ছাত্রদের প্রতি তার অন্তিম উপদেশ ছিলো :

"হে আমার ছাত্রগণ! সর্বদা তবলীগে রত থেকো"।

এরূপ মহান এক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব দীর্ঘ কাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেবের ছাত্র এবং তাঁর পরিচালিত প্রথম মুবাল্লেগ ক্লাসের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন

করেন। এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একজন সাহাবীর সরাসরি ছাত্র হবার প্রেক্ষিতে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান ঢাকার এক সরকারী সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল সে সময়ে দেশের সেরা মাদ্রাসাগুলোর এটা অন্যতম। কাদিয়ান আসার পর প্রথম দিকে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ) ও অন্যান্য বুযূর্গদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সনে অস্থায়ীভাবে একটি মুবাল্লেগ ক্লাস চালু করা হয়েছিল। এর জন্যে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল না। এ ক্লাসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ)। এ ক্লাসে সে সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত আলেমগণও বক্তৃতা করতেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে মুবাল্লেগ ক্লাস শুরু হয় ১৯২০ সনে। এ ক্লাসে মৌলভী ফাযেল পাশ ছাত্রদের নেয়া হয়। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব এ মুবাল্লেগ ক্লাসের প্রথম সারির ছাত্র ছিলেন। এ ক্লাসের সফল ছাত্রদের 'মুবাল্লেগ' নামে অভিহিত করা হয়।

এ ক্লাসের তত্ত্বাবধায়ন ও শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ ভার হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব(রাঃ)-এর উপর ছিল। হযরত হাফেয সাহেব এ ক্লাসে যেন পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারেন এ লক্ষ্যে নাযেরে তালীফ ও ইশায়াতের তরফ হতে এ ঘোষণা দেয়া হয়: "হাফেয রওশন আলী সাহেবকে তালীফের দপ্তর হতে অবকাশ দিয়ে মুবাল্লেগ তৈরি করার লক্ষ্যে একটি কোর্স পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো। এ কোর্স দু'বছরের হবে। এ কাজে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তাই এ সময়ের মধ্যে হাফেয সাহেবকে দারুল আমানের (কাদিয়ান) বাইরে পাঠানো যাবে না। সুতরাং কাদিয়ানের বাইরের জামাতসমূহ যেন তাকে কোথাও ডাকার অনুরোধ থেকে বিরত থাকেন"[৮]

এভাবে আল্লামা জিল্লুর রাহমান হাফেয রওশন আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তরবিয়ত প্রাপ্ত ওয়াকেফীনদের অন্তর্ভুক্ত হন। এ ক্লাসে তাঁর সাথে অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা জালালউদ্দিন শামস্ সাহেব, হযরত মাওলানা গোলাম আহমদ বাদ্দু মালহী সাহেব এবং হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব। হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব প্রায় দু'বছর পর মাদ্রাসা আহমদীয়া হতে পাশ করে এ মুবাল্লেগ ক্লাসে যোগ দেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর ১লা আগষ্ট ১৯২২ তারিখে শুরু হওয়া বিখ্যাত দরসূল কুরআন ক্লাসে জিল্লুর রাহমান সাহেব নিয়মিত ছাত্র হিসাবে সরাসরি খলীফাতুল মসীহ সানীর (রা:) কাছ থেকে কুরআনের তফসীর ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার সৌভাগ্য পান। এ মহতী দরসে উপস্থিত সফল ব্যক্তিদের নামের তালিকা পরবর্তীতে আল্ ফযলে প্রকাশিত হয়েছিল। এ তালিকায় জিল্লুর রাহমান সাহেবের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তিনি এ দরসের বংঙ্গানুবাদ কুরআন-তত্ত্ব নামে পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশ করেন । উল্লেখ্য, এ দরসে বাংলাদেশের প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবও ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এ দরসে বাংলাদেশের আরও তিন ব্যক্তি হযরত মৌলভী মোবারক আলী সাহেব, মৌলভী রহমত আলী সাহেব এবং সূফী মতিউর রহমান সাহেবও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

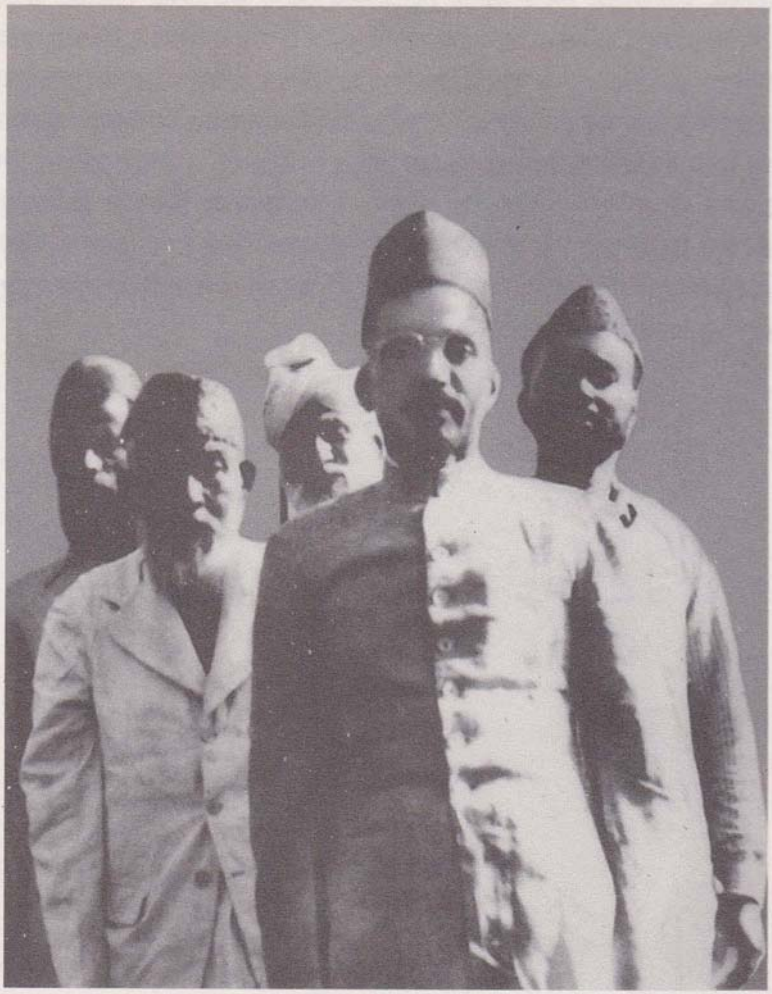

পিছনের সাড়িতে বাঁ-দিক থেকে ঃ মৌলভী কফিল উদ্দীন সাহেব, মৌলভী রহমত আলী সাহেব (মোবাল্লেগ ইন্দোনেশিয়া) ও মৌলভী আলী আকবর সাহেব। সামনের সাড়িতে বাঁ-দিক থেকে ঃ আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব ও প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব।

কর্মজীবন

"হে আমার ছাত্রগণ! সর্বদা তবলীগে রত থাকবে"

এ ছিল ছাত্রদের প্রতি হাফেয রওশান আলী সাহেবের অন্তিম উপদেশ। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তাঁর উস্তাদের এ উপদেশ আজীবন পালন করে গেছেন।

১৯২৩ সনে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় এক শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এ আন্দোলন প্রতিহত করে নবদীক্ষিত মুসলমানদের টিকিয়ে রাখার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) শুদ্ধি আন্দোলন মোকাবেলা করার জন্য এক তাহরীক করেন। উক্ত তাহরীকে অংশ গ্রহণকারী আহমদী যুবকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, "২৪ ঘন্টার" নোটিশে কাদিয়ান হতে শুদ্ধি আন্দোলনের এলাকায় পৌঁছতে হবে এবং মুসলমানদের পুনরায় মুশরেক হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। তাদের এ সংগ্রামে কেন্দ্র থেকে কোন প্রকার সাহায্য আসবে না। সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে নিজ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার দ্বারা পরিস্থিতির মোকাবেলা করত হবে। অচেনা অজানা জায়গায় বন্ধু-বান্ধবহীন বৈরী পরিবেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের মোকাবেলা করতে হবে অহিংসভাবে। যেখানে প্রতি মূহূর্তে বিপদ ও মৃত্যুর হাতছানি। মাওলানা জিল্লুর রাহমান তাহরীকে অংশগ্রহণকারী যুবকদের একজন ছিলেন যারা একদিনের নোটিশে কাদিয়ান হতে শুদ্ধি আন্দোলনের এলাকায় পৌঁছান। এখান থেকেই মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের কর্ম জীবন শুরু হয়।

কাদিয়ানে হিজরত করার পর ১৯১৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:)-এর জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ (জীবন উৎসর্গ) করার তাহরীকে সাড়া দিয়ে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ তিনি আহমদীয়তের কেন্দ্র কাদিয়ানে গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে অবিভক্ত বাংলার মোবাল্লেগ হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত ছিল তেমনি কর্মময় জীবনও বর্নাঢ্য ও বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্‌তাআলার ব্যাপক পরিকল্পনা সচরাচর মানুষের চিন্তা-চেতনার অগোচরে থাকে। বাংলাদেশের কাদা মাটিতে গড়া যে দুই যুবক একদিন সত্যের আলোর সন্ধানে দেশত্যাগ করেছিল, আল্লাহ্ তাদের আত্মত্যাগ গ্রহণ করেন এবং কালের আবর্তে তাঁদেরকেই সত্যের আলোক-বর্তিকা হাতে দিয়ে ছড়িয়ে দিলেন পৃথিবীর দু'প্রান্তে। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবকে নিজ দেশ বাংলায় এবং জনাব মতিউর রহমান সাহেবকে সুদূর আমেরিকায়।

কাদামাটি যেমন শিল্পীর নিপুন হাতে পড়ে বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে ভাটীর আগুনে পুড়ে পুড়ে এক মনোরম তৈজষে পরিণত হয়, তেমনি বাংলার কাদামাটিতে গড়া দুই যুবক যোগ্য নেতা ও যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পাঠশালায় বিভিন্ন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইসলামের খাঁটি সেবকরূপে কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করেন।

১৯৩৫ হতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত তিনি বাংলায় মোবাল্লেগ হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৩৫-৩৬ সনে বত্রিশটি স্থানে সফর করেন। ১৯৪০-৪১ সনে তিনি বিয়াল্লিশটি তবলীগী ভাষণ, বাইশটি স্থানে তেরশ' তেইশ মাইলের সফর ও চারটি ধর্মীয় বিতর্ক করেন। আর এ সনেই তিনি সাতশ' পৃষ্ঠার 'হাদীসুল মাহ্‌দী' নামক পুস্তকটি রচনা করেন। উপরোক্ত রিপোর্ট মজলিসে শূরার রিপোর্ট লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯৪৭-৪৮এ বাংলার কেন্দ্র ঢাকাতে স্থানান্তর হয়। সে সময়ে চৌধুরী মুজাফ্‌ফর উদ্দীন সাহেব প্রাদেশিক সেক্রেটারী হিসাবে ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৯-৫০ সনে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবকে চিনিউটে নিয়োগ দেয়া হয়। সে সময়ে তিনি হাফেযআবাদ, গুজরাঁওয়ালা, কসুর, লাহোর, প্রেমকোট,খাগগার,রাহওয়ালী ও তেহাল চক প্রভৃতি স্থানে সফর করেন। ১৯৫০ সনে তিনি আবার তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান। ইতোমধ্যে সৈয়্যদ এজায আহমদ সাহেব, মৌলভী আবুল খায়ের মহিব্বুল্লাহ্ সাহেব, মৌলবী ফারুক আহমদ সাহেব, মৌলবী মমতাজ আহমদ সাহেব, মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব মুয়াল্লেম ও মৌলভী মুনাওয়ার আলী মোয়াল্লেম সাহেব তবলীগের কাজে নিয়োজিত হন।[৯]

অবিভক্ত বাংলায় সে সময়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, চিটাগাং-এ হযরত মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ও প্রফেসর আব্দুল লতীফ সাহেব এবং হযরত খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব এবং অন্যান্য বুযূর্গ তবলীগের ময়দান চাঙ্গা করে রেখেছিলেন। বাংলায় আহমদীয়তের ইতিহাসের এ এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সে সময়ে রিপোর্ট পড়ে জানা যায়, এ সকল বুযূর্গ উঠতে-বসতে, সফরে অর্থাৎ সর্বদা যেন তবলীগেই মগ্ন থাকতেন।

মোকার্‌রম হেকিম খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেবও ১৯১৫ সন হতে বাংলায় তবলীগি তৎপরতায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি খান বাহাদুর আবুল হাশেম সাহেবকে নিজের সাথে রাখতেন এবং বাংলার প্রান্তে প্রান্তে তবলীগ করে বেড়াতেন। মোক্‌রম মুঙ্গেরী সাহেব উর্দূ ভাষায় বক্তৃতা করতেন। যেখানে ধর্মীয়

বিতর্ক অথবা আলেমগণের সাথে তবলীগ হতো সেখানে উর্দূতেই কথা হতো কিন্তু জনসাধারণের মাঝে তবলীগের সময়ে মুঙ্গেরী সাহেব উর্দূতে বলতেন ও খান বাহাদুর সাহেব-এর অনুবাদ করতেন।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের আসার পুর্ব পর্যন্ত বাংলায় এভাবেই তবলীগ হতে থাকে। তখন পর্যন্ত কোন ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মোবাল্লেগ এখানে ছিলেন না। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব হাফেয রওশন আলী সাহেবের মুবাল্লেগীন ক্লাস হতে পাশ করে ১৯২৬ সনে অবিভক্ত বাংলার মুবাল্লেগ নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলায় তিনিই একমাত্র মুবাল্লেগ ছিলেন। এ সময়ে তিনি উত্তরে রংপুর, জলপাইগুঁড়ি ও দক্ষিণে পটুয়াখালীর সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত গোটা এলাকা তবলীগী সফর করেন ও জামাত প্রতিষ্ঠিত করেন। এসব সফরে তিনি বহু ধরনের বিপদ-আপদের শিকার হন ও কষ্ট সহ্য করেন।

১৯২৬ সনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়াকে কেন্দ্র করে বাংলার উত্তর-পূর্ব এলাকা সফর করেন, এ সফরের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সফর স্থগিত করেন। আরোগ্য লাভের পর ভরতপুর, দমদম, সৈয়দপুর, বেলাকোবা, জলপাইগুঁড়ি ও গাইবান্ধা সফর করেন। ১৯২৭ সনে জলপাইগুঁড়িকে কেন্দ্র করে কাজ করতে থাকেন। ১৯২৮ সনে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জলসায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ আসেন তখন তিনি এ জলসায় অংশগ্রহণের জন্যে জলপাইগুঁড়ি হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসেন। ১৯২৯ সনে তিনি সম্ভবত: ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করেন। সে সময়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাদ্রাসা আরাবীয়ার মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইদ্রিসকে ধর্মীয় বির্তকের জন্যে আহ্বান করেন কিন্তু মাওলানা ইদ্রিস সাহেব এ আহ্বানে সাড়া দেন নি।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের দূর-দূরান্তে সফর করে তবলীগ করার কথা বলতে গিয়ে মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব বলেন, আমি তাঁকে কর্মক্ষেত্রে দেখি নি তবে নিজ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মাওলানার কর্মতৎপরতার ছাপ দেখে অভিভূত হয়ে যাই। ইংরেজ সরকারের আমলে তিনি একা অবিভক্ত বাংলার পূর্ব হতে পশ্চিম এবং উত্তর হতে দক্ষিণের সমুদ্র সৈকত ও হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত নির্ভীক সৈন্যের ন্যায় পদচারণা করেছেন ও আধ্যাত্মিক খোরাক বিতরণ করে গেছেন। তিনি তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত ও অভিভূত করে রেখেছিলেন। তিনি অবিভক্ত

বাংলার আনাচে-কানাচে দাপটের সাথে কর্মতৎপরতা চালিয়ে ছিলেন। তিনি নদীর উত্তাল তরঙ্গ, গহীন জঙ্গলের দুর্গম পথ ইত্যাদি কোন কিছুরই পরওয়া করতেন না। তাঁর তবলীগী সফরের ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী আমি বহু লোকের নিকট শুনেছি এবং অনেক স্থানে আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

আমি যখন (পাকিস্তান আমলে) উত্তর বাংলায় কর্মরত ছিলাম, তখন একবার এক মুয়াল্লেমকে সাথে নিয়ে পঞ্চগড়ের আহমদনগর হতে আট মাইল দূরে মীরগড়ে তবলীগ করতে যাই। ইংরেজ আমলে আহমদনগর আবাদ হয় নি। ১৯৫১-১৯৫৩ সনে আহমদী মুহাজেরীন এসে আহমদনগর আবাদ করেন। এখানে তখন জঙ্গল ছিল। এখানে মাশাআল্লাহ্ এখন একটি বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত। এখানে বর্তমানে সুরম্য মসজিদ ও আঞ্জুমানের অফিস ও গেষ্ট হাউজ আছে। আসার সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। ছোট নদীও পার হতে হয়। ইংরেজ আমলে এটা একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল ও লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। যখন আমরা মীরগড় পৌছে লোকদের সাথে কথা-বার্তা বলি ও আহমদীয়তের পরিচয় তুলে ধরি তখন সেখানকার বয়স্ক লোকেরা বলেছেন, এখানে বি এ পাশ এক যুবক আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। সে যৌবনেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বলল-তুমি কাফের হয়ে গিয়েছো,তোমার জানাযা তো কেউ পড়বে না। প্রতি উত্তরে সে তার আত্মীয়দের বলেছিল, আমার জানাযার ব্যাপারে তোমরা কোন চিন্তা করো না। শুধু জলপাইগুঁড়ির নিকট বেলাকোবাতে অবস্থিত আহমদীদের খবর দিও তারা যেন আমার জানাযার নামায পড়ে। লোক এসে যাবে। সুতরাং তার মৃত্যুর পর বেলাকোবায় খবর পৌছানো হয়। (বেলাকোবা হতে মীরগড় চল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। কাকতালীয়ভাবে মাওলানা সাহেব সফর করতে করতে বেলাকোবাতে পৌছেছিলেন)। সে সময়ে আপনাদের জামাতের এক আলেম কিছু আহমদীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। জানাযার পর তিনি আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর কথা শুনান।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা আমার মনে আছে। আহমদনগর হতে উত্তরে তেঁতুলিয়া একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। ইসলাহ ও ইরশাদ'এর মোয়াল্লেম আবূ তাহের সাহেবকে নিয়ে আমি সেখানে তবলীগ করতে যাই। গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল এলাকায় কোন আহমদী নেই। আমরা মনে করলাম, আমরাই হয়ত সর্বপ্রথম আহমদীয়তের পয়গাম নিয়ে আসলাম। আমরা সারাদিন ঘুরে ফিরে তবলীগ করতাম ও সন্ধ্যায় কোন ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বর অথবা কোন সম্মানিত ব্যক্তির ঘরে থাকতাম। এক রাতে এক মেম্বার সাহেবের বাসায় ছিলাম, আমরা

তবলীগ শুরু করলে তিনি বললেন, 'আপনাদের জামাতের একজন প্রখ্যাত আলেম জিল্লুর রাহমান সাহেব এ এলাকাতে এসেছিলেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণকে কোন আলেম খন্ডন করতে পারে নি।' মেম্বর সাহেবের কথা শুনে আমি আশ্চার্যান্বিত হলাম, মাওলানা সাহেব কেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছেছেন এবং কত কষ্ট করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়তের নিষ্ঠাবান এ প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং জান্নাতের উচ্চতম মার্গে তাঁকে স্থান দিন', আমীন"।

তখন বাংলাদেশের তবলীগের জন্য প্রশস্ত ময়দান ছিল। বাংলায় হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সাথে ধর্মীয় মোকাবেলা ছিল। হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব যেমন নিজে আর্য খৃষ্টান ও অ-মুসলিমদের সাথে ধর্মীয় বির্তক করতেন,তেমনি হাফেয সাহেবের ছাত্রদের মাঝে হযরত মাওলানা আবুল আতা সাহেবও অসংখ্য ধর্মীয় বির্তক করে বিখ্যাত হয়েছেন। হযরত হাফেয সাহেবের ছাত্রগণও খৃষ্টান ও আর্যদের সাথে বির্তকের জন্য নিজেদেরকে সদা-সর্বদা ধর্মী জ্ঞানের ঐশ্বর্যে প্রস্তুত রাখতেন।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের কর্মস্থল বাংলায় নির্ধারণ করা হয়। তাঁর ধমনির শোণিতে হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেবের শিক্ষা প্রবাহিত ছিল। তিনি সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। সুতরাং যেখানেই আর্য ও খৃষ্টানদের তরফ হতে ইসলামের উপর আক্রমণ হতো তিনি সেখানেই হাজির হতেন অতন্ত্র প্রহরির ন্যায়। একবার বাংলার এক এলাকার খৃষ্টানগণ সু-পরিকল্পিতভাবে কলেজে ছাত্র সমাজে তাদের প্রচারে কাজ করতে শুরু করে। এর ফলে অনেক মুসলমান ছাত্র খৃষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকারের জন্য কোন কোন ধর্মপরায়ণ মুসলমান যখন আলেমদের সাথে যোগাযোগ করে তারা এদের কথায় কান দিল না। ইতোমধ্যে কেউ বলল, মাওলানা জিল্লুর রাহমান নামক কাদীয়ানী আলেম, এই আক্রমণ রুখে দিতে পারবে। সুতরাং তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্দ্বিধায় বরিশালের সেই কলেজে যান এবং খৃষ্ট ধর্মের অসারতার উপর বক্তৃতা দেন।একটি বক্তৃতাতেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়।

এ ঘটনা সম্পর্কে জনাব মুহাম্মদ মতিউর রহমান সাহেব বলেন, "বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে আমার বন্ধু-সহকর্মী আলী আহমদ খন্দকারকে অনেক তবলীগ করেছি ও বই দিয়েছি। তিনি বয়াত করেন নি। তিনি আহমদীয়ত সম্বন্ধে অনেক জানতেন। একবার আলী আহমদ সাহেব বললেন, 'আমি তখন বরিশাল বি.এম কলেজের ছাত্র। সে সময়ে একবার খৃষ্টানদের তরফ হতে পরিকল্পিতভাবে

কলেজে খৃষ্টধর্ম প্রচার ব্যাপকভাবে হতে লাগল। যুবকদের একটি বড় অংশ খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো। সাধারণ আলেমদের মাঝে তাদেরকে রুখবার ক্ষমতা ছিল না। ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম কাদিয়ানী আলেম মাওলানা জিল্লুর রাহমান এ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন। সুতরাং আমরা আয়োজন করে তাঁকে আমাদের কলেজে নিয়ে গেলাম। বি.এম কলেজে মাওলানার জিল্লুর রাহমান সাহেবের একটি বক্তৃতাই যেন বাধভাঙ্গা স্রোতের দিক পাল্টে দিল এবং খৃষ্টধর্মের প্রচার স্তব্ধ হয়ে গেল"।

অনুরূপভাবে ১৯২৮ সনে রংপুরের এক অঞ্চলের উপজাতিরা খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তাদের মধ্যে তবলীগ করেন ফলে তারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। এ প্রচেষ্টার কিছু দিনের মধ্যে একশ' জনের অধিক লোক আহমদী হয়ে গেল। তিনি সর্বদা আর্য ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য সোচ্চার ছিলেন। মুসলমান শিক্ষিত সমাজের সাথে মিলে সর্বদা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য চেষ্টা করতেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে তিনি সাক্ষাৎকার ও তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমেও কাজ নিতেন। তিনি থিওসফিকাল হল ও রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েও বক্তৃতা করেছেন।

তিনি অত্যন্ত সরল ও নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। স্বভাবের মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়া দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে শীঘ্রই লোকজন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। যে কোন শ্রেণীর মানুষের সাথে তাদের ব্যক্তিত্ব, মন-মানসিকতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদ-মর্যাদা অনুযায়ী কথা বলতে পারদর্শী ছিলেন। বড় বড় জনসমাগমে নির্দ্বিধায় নিজ বক্তব্য তুলে ধরতে পারঙ্গম ছিলেন। উচ্চ শিক্ষিতদের মাঝে দার্শনিক ভঙ্গিতে বক্তব্য উত্থাপন করতে পারতেন। তিনি দর্শকদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়- গুলোকে সামনে রেখে কথা বলতেন।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের তবলীগ করার এক বিশেষ ভঙ্গী ছিল। হাফেয রওশন আলী সাহেবের শিষ্যত্ব যেন তাঁর অলংকার হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষক যেমন এক জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন তেমনি ছাত্রও নিজ রূপে বহমান এক নদী ছিলেন।

একদিন এক নবাব সাহেবের বাড়িতে সাক্ষাতের জন্য তাঁর কার্ড পাঠান। যখন মাওলানা সাহেবকে ডাকা হ'ল তখন নবাব সাহেব নিজ সাথীদের সাথে কথা বলছিলেন। একজন নবাগত মৌলভীকে দেখে স্বার্থান্বেষী মৌলভী মনে করে অনীহা প্রকাশ করে কথা বলতে আগ্রহী হলেন না। মাওলানা সাহেব কিছুক্ষণ

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সম্রাট শাহজানের মত রুচির সৌন্দর্যবোধ দিয়েছেন। এ কথা শুনে হঠাৎ নবাব সাহেবের দৃষ্টি মাওলানা সাহেবের প্রতি আকৃষ্টি হলে মাওলানা সাহেব আবার বললেন,কি সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করেছেন! সাথে মানানসই বাগানও লাগিয়েছেন !এবার নবাব সাহেব তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলেন এবং মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী হলেন। আর এভাবে মাওলানা তাঁর সাথে ৪৮ ঘন্টা তবলীগী আলাপ আলোচনা চালিয়ে গেলেন।

মাওলানা সাহেব এভাবে প্রত্যেকের সাথে তাঁর ব্যক্তিত্ব , যোগ্যতা ও অবস্থান অনুযায়ী কথা বলতে পারতেন। চরম অহংকারী ব্যক্তির সাথে কথার প্রারম্ভেই এমন কথা বলতেন যে, সে নির্বাক হয়ে যেত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিদেশী নাস্তিক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কাউকে খোদার অস্তিত্বের ব্যাপারে কথা বলার সুযোগই দিতেন না। কিছু লোক মাওলানা সাহেবকে বললেন, তার সাথে কথা বলা দরকার। সুতরাং তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। শুরুতেই তিনি অধাপকের পিতার নাম জিজ্ঞেস করলেন। যখন অধ্যাপক সাহেব নিজ পিতার নাম বললেন। মাওলানা বললেন, আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, তিনি আপনার পিতা। অধ্যাপক সাহেব তার কথা শুনে চমকে গেলেন। তিনি আবার বললেন, আপনি কি নিশ্চিত যাকে পিতা বলছেন তিনিই আপনার পিতা। এতে অধ্যাপক সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করলেন। অত:পর মাওলানা সাহেব দার্শনিকের মত বললেন, আপনার পিতার পরিচয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত সাক্ষী আপনার মা। আপনার মার পবিত্রতার উপর বিশ্বাসের কারণেই আপনার নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মেছে যে, যাকে আপনি পিতা বলে জানেন তিনিই আপনার পিতা। তারপর তিনি কুরআন মজীদের দলিল দিয়ে তাকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ব্যাপারটি বুঝাতে সক্ষম হলেন। সম্ভবত মাওলানা সাহেব কুরআন শরীফের আয়াত– يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ "ইয়ারিফুনাহূ কামা ইয়া'রিফুনা আবনায়াহুম"– তাকে সেভাবেই চিনো যেভাবে নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে থাকো (সূরা আল্ বাকারা ঃ ১৪৭ আয়াতাংশ) আয়াতের ভিত্তিতে বিষয়াদি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক মন্তব্য করেন, আজ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় ব্যক্তি এমন দলীল উপস্থাপন করে আমার সাথে কথা বলেন নি।[১০]

প্রাত:ভ্রমণে মাওলানা সাহেবের সাথে সতীশ চন্দ্র নামে এক হিন্দু পন্ডিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হতো। তার সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনাও হতো। একদিন তিনি মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা হযরত মুহম্মদ (স:)-কে কী মনে করেন এবং তাকে (স:) কতটুকু মর্যাদা দেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা হযরত মুহম্মদ (স:)-কে খোদার রসূল বলে মানি এবং সকল

নবীর চাইতে বেশি সম্মান দেই। এভাবে তিনি আঁ হযরত (স:) সম্বন্ধে বর্ণিত "আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ" বাক্যের অর্থটি সতীশ বাবুকে তার মত করে বুঝিয়ে দিলেন। সতীশ চন্দ্র বললেন, আমিতো মুহাম্মদ (স:)-কে ভগবান জ্ঞান করি। সুতরাং আমি তাঁকে আপনাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেই, বেশি সম্মান করি। মাওলানা সাহেব বললেন, কারও সত্যিকার প্রশংসা তাঁর মর্যাদানুযায়ীই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সতীশ চন্দ্র বললেন, বাহ্ ভাই বাহ্। আমি তাঁর (স:) মর্যাদা বাড়িয়ে দিচ্ছি আর আপনি এমন যে, তা মানছেন না। মাওলানা সাহেব পৌত্তলিক ধর্ম-বিশ্বাসকে সামনে রেখে ও তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে কথা বলছিলেন। তিনি জানতেন, কোন্ আংঙ্গিকে কথা বলতে হবে। সুতরাং তিনি সেটা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃত সম্মান ও প্রশংসা তার প্রকৃত মর্যাদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু সতীশ চন্দ্র বাবু তা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন মাওলানা সাহেব বলেন, ঠিক আছে, আপনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজ স্ত্রীকে মাতাজি বলে সম্বোধন করবেন। এতে যদি আপনার স্ত্রী আশ্চার্যান্বিত হয় তবে তাকে বলবেন, হে আমার স্ত্রী' আমিতো আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করছি। আর আপনি আমার কথা মানছেন না। এর পরেও যদি আপনার স্ত্রী আপনাকে পাগল বলে ও মারতে আসে তখন বলবেন, তুমি আশ্চর্য মেয়েমানুষ আমি তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করছি আর তুমি এমন করছো। সুতরাং এর ফলে সতীশ চন্দ্র বাবু বিষয়টি বুঝে গেলেন এবং সুন্দর পরিবেশে কথাবার্তা চলতে লাগলো।[১১]

"১৯৩৭ সালে মার্চ মাসে কলকাতার পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন্স-এর অধিবেশনে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ বক্তৃতায় ধর্ম প্রচার দ্বারা পৃথিবীময় ধর্মের সাম্রাজ্য স্থাপনের বিরুদ্ধে কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন"। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য লক্ষ্য করেন এবং সেই বছরই ২৩শে মে বগুড়া এডওয়ার্ড করনেশন হলে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক জলসায় বলিষ্ঠ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্য খন্ডন করেন। পরবর্তীতে পাক্ষীক আহমদী পত্রিকার ১৯৩৭ সালে জুন সংখ্যায় "ধর্মে সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হল যা থেকে মাওলানা সাহেবের যুক্তি-তর্ক ও বক্তব্য উপস্থাপনের বলিষ্ঠতা ও ভাষার সাবলিলতা অনুমান করা যায় :

"যে সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া মানবের ইহজীবনেরও মৃত্যু ও পরপারের অনন্ত জীবন কল্যাণময় হয়, যে সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া মানুষ বিশ্ব-স্রষ্টাকে লাভ করিতে পারে, যে শিক্ষা বিশ্ব-স্রষ্টা মানবের ইহকাল ও পরকালকে কল্যাণ মন্ডিত করবার জন্য ঐশী প্রেরিত মহাপুরুষগণের মারফত দান করিয়াছেন, যে নিত্য সত্যসমূহ মানুষের সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করে ধর্ম বলিতে সাধারণত: লোকে ইহাই বুঝিয়া থাকে।"

"কাহারো আধিতপ্য স্বীকার না করার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

অন্যায়ের আধিতপ্য স্বীকার করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেওয়ার নাম গোলামী।

অন্যায়ের গোলামী করিব না বলিয়া ন্যায়ের সম্মুখেও মস্তক অবনত করিব না ইহা মুর্খতা"।[১২]

ধর্মীয় বিতর্ক (মোনাযারা)

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও নরম প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু তবলীগের ময়দানে তিনি নির্ভীক অকুতোভয় ও ব্যাঘ্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কোন বিপদ ও আশংকার পরওয়া করতেন না। বরং নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হয়ে সাহসীকতার সাথে বিপদের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনে অনেক ধর্মীয় বিতর্ক করেছেন। সেগুলোর মাঝে বাশারুক, তারুয়া, প্রেমারচর, ঘাটুরা, রংপুর-এর ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

বাশারুক

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পশ্চিমে বাশারুক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সে গ্রামের জনাব রহমত আলী আহমদী হওয়াতে গ্রামে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। এক পর্যায়ে অ-আহমদী মাওলানার পরিকল্পনা করলেন, বাজারের মধ্যে মোক্ষম দিবে যে, কাদিয়ানী মাওলানা বহসে আসে নি। তাই তারা পরাজিত। অপরদিকে কাদিয়ানী মাওলানাকে পথের মাঝেই বাধা দেয়া হবে যাতে সভাস্থলে তারা পৌঁছতে না পারে। সভার দিন যত নিকটবর্তী যাচ্ছিলো গ্রামের পরিস্থিতি ততই বিস্ফোরণ মুখী হচ্ছিলো। অবস্থা মোকাবেলা করতে মৌলানা জিল্লুর রাহমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মসজিদে খোদ্দামদের একত্র করে কিছু সেচ্ছাসেবী চাইলেন যারা মৃত্যুকে পরওয়া না করে যাবে এবং তিনি যেভাবে বলবেন সেভাবে অবস্থার মোকাবেলা করবে। কিছু যুবক সেচ্ছাসেবী তৈরি হয়ে গেল।

বহসের নিধার্রিত দিনে একজন দু'জন করে আহমদী যুবক গ্রামে এমনভাবে প্রবেশ করতে লাগলো যেন কেউ কাউকে চিনল না। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ী বাধা। বগলে লাঠির মাথার পুটলিতে চিড়াগুড়। গ্রামের পুকুর পারে বসে পানিতে ভিজিয়ে চিড়াগুড় খেয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। গ্রামের মুরব্বীরা এ সমস্ত ছেলেদের দেখে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথায় যাবেন, কোথা থেকে এসেছেন? উত্তরে কেউ কিছু বললেন না, বা কেউ কেউ বললেন কাদিয়ানীদের বহস শুনতে এসেছি। যুবকদের শান্ত, ভদ্র, মূর্তি, ভদ্র ব্যবহার,

কারো কোন মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের কাজ নিজেরা করা বিশেষ করে গাছতলা বসে চিড়াগুড় লওয়ার দৃশ্য শান্তি-প্রিয় নিরীহ গ্রামবাসীদের মনে তাদের প্রতি এক শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হতে লাগলো। যথা সময়ে বাজারে লোক সমাগত হতে লাগলো। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন সভাস্থলের বিভিন্ন স্থানে থেকে অবস্থার পর্যালোচনা করে। এবং প্রয়োজনে একসাথে বলে যে, আমরা কাদীযানী মাওলানাদের বক্তব্যও শুনতে চাই। যথারীতি সভা শুরু হওয়ার আগে অ-আহমদী মাওলানা রহমত আলী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের এমন কোন মাওলানা কি আছেন যে আমাদের গ্রামে বহস করবেন। তাদের ধারণা ছিল কাদিয়ানীরা ভয়ে হয়তো কেউ আসেন নি। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব জনসমাগমের ভীড়ে সাধারণভাবে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সামনে এসে বললেন, "আমি কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে আপনাদের যা কিছুর উত্তর দিবো।" মাওলানা যখন দেখলো যে, বহসের জন্য একজন কাদিয়ানী মাওলানা হাজির আছেন। তারা ঠিকই জানতো যে বহসে কাদীয়ানীদের সাথে পেরে উঠবে না। তাই তারা যখন দেখলো যে, একজন মাওলানা উপস্থিত হয়ে গেছেন তখন তারা বিভিন্ন উছিলায় সরে পড়তে চাইলো। কিন্তু তখন সভাস্থলের বিভিন্ন দিক থেকে লোকজন দাবী করলো আমরা আহমদীদের ওয়াজ শুনতে চাই। শেষ পর্যন্ত অ-আহমদী মাওলানা সরে পড়লেন এবং বহসের পরিবর্তে মাওলানা জিল্লুর রাহমান এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়াতে সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে আহমদীয়তের সৌন্দর্য তুলে ধরতে সক্ষম হন। সভার পরে গ্রামের প্রধান আহমদীদেরকে গরু জবাই করে আপ্যায়ন করেছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এবং মাওলানা সাহেবের বিচক্ষতা, সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে সে সময় আহমদীগণ সে গ্রামের বিস্ফুরনোন্মুখ পরিস্থিতি শামলিয়ে আহমদীয়তের বিজয় নিশ্চিত করতে পেরেছিলো।

কোন এক ধর্মীয় বিতর্কের সময়ে এমন আশংকা দেখা দিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা হাঙ্গামা করবে এবং হাঙ্গামা করে আহমদীদের পরাজয়ের ঘোষণা দিবে। শ্রদ্ধেয় পিতা স্বয়ং আমাদেরকে বলেছেন, তিনি সেই ছোট্ট গ্রাম্য জামাতের যুবকদের একত্র করে তাদের কাছ থেকে মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা নিলেন যে, আমরা মরে যাবো কিন্তু মুনাযারা (ধর্মীয় বিতর্ক) স্থান ত্যাগ করবো না।

উপস্থিত সবাই মৃত্যুর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার পর তিনি প্রজ্ঞার সাথে যে অল্প সংখ্যক আহমদী সেখানে ছিল তাদের সবাইকে গোটা জলসাগাহের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন, যেখান হতে হাঙ্গামার চেষ্টা হয় সেখানেই যেন দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যালোচনা করা যায় এবং সময় মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়। মাওলানা

সাহেবের বিচক্ষণতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির কারণে তখন বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত পরিকল্পনা বৃথা যায়। মাওলানা সাহেব বলেন, সে দিনগুলোতে ঐ সমস্ত আহমদীদের পরনের উপযুক্ত কাপড়ও ছিল না। খাবারেরও অভাব ছিলো। কিন্তু তাদের আত্মত্যাগের স্পৃহা বৃথা যায় নি। এর বরকতে আল্লাহ্‌তাআলা আজ তাদের এমনভাবে আশীষমন্ডিত করেছেন যে, তাদের ঘর হতে দরিদ্রতা দূর হয়ে গেছে।[১৩]

তারুয়া

১৯৩৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী। তারুয়াতে আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে এক ধর্মীয় বিতর্কের আয়োজন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ সলীম সাহেব সবে মাত্র মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় মোবাল্লেগ হিসাবে যোগদান করেছেন। তাকে এ ধর্মীয় বিতর্কের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলকতা হতে যাত্রা করে আট তারিখে তারুয়া পৌছান। এ সময়ে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবও তারুয়া পৌছেন। নির্ধারিত দিনে আহমদীগণ যথা সময়ে সভাস্থলে পৌছে যান। কিন্তু অ-আহমদী মৌলবীগণ অনেক দেরী করে এক-দু'জন করে আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাদের স্টেজে দু' ডজনের মত বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মৌলবী একত্র হয়। লোক সমাগম প্রায় আট-দশ হাজার হবে। এর মধ্যে অহমদীদের সংখ্যা অতি নগণ্য।। অ-আহমদী মৌলবী সাহেবান একেতো দেরী করে এসেছিলেন তার ওপর এসেই বিতর্কের জন্য পূর্বনির্ধারিত শর্ত পরিবর্তনের ওপর চাপ দিতে লাগলেন । যদিও তাদের কাছে নিধারিত শর্ত পরিবর্তনের কোন জোরালো যুক্তি ছিলো না । তাদের মধ্যে নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি অ-আহমদী উকিল জনাব আব্দুর রউফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা পূর্বনির্ধারিত শর্ত পরিবর্তনের জন্যে চাপ দিচ্ছেন কেন? আপনারাকি পূর্বনির্ধারিত শর্তে বিতর্ক করতে পারেন না। এর উত্তরে তিনি বলেন, না এ শর্তানুযায়ী আমরা বিতর্ক করতে পারবো না। বলা হলো, আপনি লিখিত দেন। তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, অ-আহমদী মৌলবী সাহেবান কোন একটি বাহানা করে বিতর্ক করা থেকে সরে পড়তে চান। তখন উপস্থিত জনসাধারণকে এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হলো যে, অ-আহমদী মৌলবী সাহেবগণ পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী বিতর্ক করতে চাচ্ছেন না, কিন্তু আহমদীরা যে কোন শর্তে বিতর্কটি করতে রাজি আছে যেন বির্তক হয়। এরই মধ্যে যোহরের নামাযের সময় হলে গেল। দু' পক্ষই নামায আদায় করার লক্ষ্যে সভাস্থল ত্যাগ করলো। নামায পড়ে আহমদীরা বিতর্কের প্রথম পক্ষ হিসাবে বক্তৃতা করতে চাইলে অ-আহমদীগণ আবারও এমন একটি সংশোধনী

আনতে চাইল যা বিতর্কের মূল বিষয়ের পরিপন্থী। এরকম টালবহানা মধ্যে ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত অ-আমহদীগণ ঘোষণা করলেন, তারা আর বিতর্ক করতে চান না। সুতরাং দু'পক্ষ এ সভাস্থল ত্যাগ করে।

সভাস্থলের নিকটেই আাহমদী মসজিদ ছিল। সকল আহমদী সেখানে গিয়ে নিজেদের এক জলসার ব্যবস্থা করল। সেখানে মৌলভী মুহাম্মদ সলীম সাহেব এক উর্দূ বক্তৃতা করেন। বিতর্ক শুনতে আসা কয়েক শ' লোক আগ্রহের সাথে তাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনতে থাকে। তাদের নিকট মাওলানা সলিম সাহেবের কাদিয়ান হতে আগমন ও হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর দাস হওয়ার বিষয়টি একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। মাওলানা সলিম সাহেবের বক্তৃতার অনুবাদ পর্যায়ক্রমে মৌলবী গোলাম সামদানী উকিল সাহেব ও মৌলভী জিল্লুর রাহমান সাহেব করেন। এর ফলে সাধারণ লোকদের মাঝে আহমদীয়তের পক্ষে ও অ-আহমদী মৌলবীদের বিপক্ষে জনমতের সৃষ্টি হয়। খোদার ফযলে তখন তেরজন বয়াত করেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ। তিনি এক সপ্তাহ তারুয়া অবস্থান করে ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ফিরে আসেন।

আরবী ভাষায় চৌদ্দ ঘন্টার বিতর্ক

১৯৩৫ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী মাওলানা মুহাম্মদ সলীম সাহেবকে একজন আহমদী ধর্মীয় বক্তৃতা করার জন্য ব্রাক্ষণবাড়িয়া আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। মহিলাদের আগ্রহের কারণে তাদের জন্যও বক্তৃতা শুনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মদ সলীম সাহেব তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এবং মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তাঁর বক্তৃতা ধারা বর্ণনার মত বাংলায় অনুবাদ করে শুনাচ্ছিলেন। মৌলানা সুশৃঙ্খলভাবে অনুবাদ করে চলছিলেন।

জলসার এক পর্যায়ে হঠাৎ করে অ-আহমদী মৌলবীগণ একজন দু'জন করে প্রবেশ করতে লাগল। এভাবে ৩০-৩৫ জন অ-আহমদী মৌলবী জলসাগাহে প্রবেশ করে জলসাগাহে বসে পড়লেন। এটা ব্রাক্ষণবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ মৌলবী তাজুল ইসলাম সাহেবের একাটা সাজানো পরিকল্পনা ছিল। জলসার মধ্যে কোন একটি সূত্র ধরে হট্টগোল করা এবং জলসা পন্ড করা। যথারীতি এক সময় অ-আহমদী মৌলবী অযথা চিৎকার করে মাওলানা সলীম সাহেবের বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। এক সময় তাদের পক্ষ থেকে দাবী উঠল বক্তৃতা নয়, আমরা দু'পক্ষের মধ্যে প্রশ্নোত্তর আকারে বিতর্ক শুনতে চাই। এ ব্যাপারে আহমদীদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। প্রয়োজনীয় বই-পুস্তকও সাথে নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে তারা প্রশ্নোত্তর আকারে বিতর্কে সম্মত হলেন।

এ পর্যায়ে মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব সামনে এসে গেলেন। বুঝা গেল আহমদীদেরকে ধমীর্য় বিতর্কে কাবু করার জন্য এটা তারই সাজানো নাটক

ছিলো। তিনি নিজে একজন সম্মানীত ও প্রতিষ্ঠিত আলেম, মাদ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রী তাঁর আছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক। জনসাধারনের একটা বিরাট অংশ তার প্রতি অনুরক্ত। নিজের আরবী জ্ঞান নিয়ে গর্ব বোধ করতেন। তিনি এসে বাংলায় কথা বলতে শুরু করলেন। মৌলভী সলীম সাহেব বল্লেন, "আমি বাংলা জানি না আপনি উর্দূতে কথা বলুন"। তাজুল ইসলাম সাহেব তখন বেশ জোরের সাথে বল্লেন, আপনি কি আরবী জানেন ? সলীম সাহেব বল্লেন, আল্লাহ্‌র ফযলে আমি আরবী ভাল জানি। তাজুল ইসলাম সাহেব চ্যালেঞ্জ দিয়ে বল্লেন, তবে আরবীতে বিতর্ক হোক। তার ধারণা ছিল আহমদী আলেমগণ ভাল আরবী জানে না। এ সুযোগে তারা আরবীতে দু' চারটা কথা বলে কেল্লা ফতেহ্ করবেন। বিতর্ক শুরু হলো। প্রথমে মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব আরবীতে কোন প্রকারে দু'একটা প্রশ্ন বা বক্তব্য রেখে বসে যান। আর মৌলবী সলীম সাহেব তাঁর উত্তরে অনর্গল দীর্ঘক্ষণ আরবীতে তার জবাব দেন। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর যখন মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের আরবীর ভান্ডার ফুরিয়ে গেলো এবং তিনি তখন উর্দূতে বলা শুরু করলেন। তখন মাওলানা সলীম সাহেব বল্‌লেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব বল্লেন, আরবীতে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী বুঝে না। উত্তরে মাওলানা সলীম সাহেব বল্লেন, আপনি কি পূর্বে বুঝতে পারেন নি যে, জনসাধারণ আরবী বুঝে না। আপনি যখন আরবীতে বলা শুরু করেছিলেন তখন কি আপনার কথা সবাই বুঝে ছিল? এখন কি হলো। মাওলানা তাজুল ইসলাম চুপ্‌সে গেলেন। শেষ পযর্ন্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত অ-আহমদী সভাপতি বলে উঠলেন, আমরা বুঝে ফেলেছি । মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব মনে করেছিলেন আহমদী আলেমগণ আরবী জানেন না। কিন্তু এবার তিনি জেনে গেলেন আহমদী আলেমগণ তার চেয়ে অনেক বেশি আরবী জানে, এবং আরবীতে তারা পারদর্শী। বিতর্কানুষ্ঠান যথারীতি আরবীতে চলতে লাগল। অ-আহমদী আলেমগণ যেন-তেন প্রকারে দু'তিন ছত্র আরবীতে বলে বসে পড়েন। উত্তরে মাওলানা দীর্ঘক্ষণ আরবীতে উত্তর দেন এবং মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তা বাংলায় অনুবাদ করে শ্রোতাদের শুনান। এভাবে রাত ৯টা থেকে পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত একাটানা এ আরবী বিতর্ক চলতে থাকে। বিতর্কের অধিকাংশ সময়টাই আহমদী আলেম মাওলানা সলীম সাহেব ও জিল্লুর রাহমান নিজেদের দখলে রেখে ছিলেন। পরদিন আবার বিতর্ক শুরু হলো। অ-আহমদী আলেমগণ বল্লেন, আমরা প্রথমে আপত্তি উত্থাপন করবো। আপনারা তার জবাব দিবেন। যথারীতি অ-আহমদী আলেমগণের আপত্তি উত্থাপন এবং আহমদী আলেমগণের জবাব দেয়া পাশাপাশি চলতে লাগলো। কিন্তু আহমদী আলেমদের উত্তরে অ-আহমদী আলেমগণ কিছু বলতে না পারলেই অসন্তুষ্ট হয়ে

বলত এটাতো কোন জবাব হলো না। এক পর্যায়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের অ-আহমদী সভাপতি ন্যায়পরায়ণতার সাথে বল্লেন, উত্তরতো দেয়া হয়েছে এবং ঠিকই আছে। আপনারা যদি না বুঝে থাকেন তা হলে অন্য কথা। এভাবে বিতর্ক শেষ হয়। এ বিতর্কের ফলে উপস্থিত জনসাধারণের মনে আহমদীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা জন্মে। সফলভাবে বিতর্কানুষ্ঠান শেষ হয়। অ-আহমদীদের পূর্ব-পরিকল্পিত হট্টগোল করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

প্রেমার চর

১৯৪৫ সালের ঘটনা। ময়মনসিংহ জিলার দক্ষিণ প্রান্ত কটিয়াদি থানার অন্তর্গত মসুয়া ইউনিয়নের অধিন প্রেমারচর একটি গ্রাম। মাওলানা তালেব হোসেন এ গ্রামে একজন বড় মাওলানা যিনি নিজ এলাকার বাঘ মাওলানা নামে খ্যাত ছিলেন। সে সময়ে ঐ এলাকায় তার সমকক্ষ কোন মাওলানা ছিলেন না। মির্যা আলী আখন্দ সাহেবের তবলীগে মাওলানা তালেব হোসেন সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তিতে জনাব আবু মুসা, জনাব আবু ঈসা এবং মৌলভী আবু তাহের সাহেব সহ আরো অনেকে আহমদিয়াত গ্রহণ করেন। মাওলানা আবু তালেব সাহেবের আহমদিয়াত গ্রহণের ফলে এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জনাব ইমামউদ্দিন মাস্টার সাহেব আহমদি ও অ-আহমদিদের মধ্যে এক বিতর্কের (বহস) আয়োজন করেন।

অ-আহমদিদের পক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের সভাসদবৃন্দ দশ গ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এবং আলেমদের আনা হয়। তৎকালীন বিখ্যাত মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে আনা হলো অ-আহমদিদের পক্ষে বিতর্কের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। আহমদিদের পক্ষে এ বিতর্কে নেতৃত্ব দেন আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব।

বিতর্কের স্থান নির্ধারিত হলো প্রেমারচর সংলগ্ন বৈরাগীরচর গ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী ঈদগাহ ময়দান। ঈদগাহ ময়দানে বহসের জন্য সূদৃশ্য মঞ্চ বানানো হলো। শৃঙ্খলা রক্ষা করা জন্য মঞ্চের চারপাশে বাঁশ দিয়ে রেলিং দেয়া হলো। রবিবার জোহর নামাজের পর বহসের সময় নির্ধারণ করা হলো। যথাসময়ে উভয় পক্ষের মাওলানারা মঞ্চে উপবিষ্ট হন। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ইমামউদ্দিন মাস্টার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বিতকৃ অনুষ্ঠান শুনার জন্য দূর দূরান্তথেকে লোকজন এসেছিলো। বিতর্ক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় দশ থেকে বারো হাজার লোক সমাগম হয়েছিলো।

বিতর্ক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অ-আহমদি মাওলানারা সবাই মিলে আলোচনা করে বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্ধারন করলেন "ওফাতে ঈছা বা ঈছা (আঃ)– এর

মৃত্যু"। মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব বললেন তিনি হাদিস থেকে প্রমাণ করবেন যে, ঈছা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন এবং চতুর্থ আসমানে অবস্থান করছেন। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব এর বিপক্ষে প্রমাণ করবেন যে ঈছা (আঃ) এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং এই পৃথিবীতেই তার রওজা মোবারক আছে। যথারীতি বিতর্ক শুরু হলো। আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে পবিত্র কোরআনের দলিলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি যতই কোরআন শরীফের দিকে মাওলানাকে আহ্বান করেন, মাওলানা তাজুল ইসলাম ততই হাদিসের দিকে যান। মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব বেশ ভালো করেই জানতেন যে, পবিত্র কোরআন দ্বারা ঈছা (আঃ) এর জীবিত থাকা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি একটু ছলনার আশ্রয় নিলেন। উপস্থিত জনসমাগমকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে বিতর্ক পন্ড করার চেষ্টা করলেন। জনতাকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, "ভাই সব এই কাদিয়ানী মাওলানা আমার তিনশত পঞ্চাশ টাকা মূল্যের হাদিস গ্রন্থ মানতে চাইছে না"। এতে করে সভা মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তখন দাড়িয়ে গেলেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন "ভাইসব হাদিস গ্রন্থ যত মূল্যবানই হোক না কেন পবিত্র কোরআন শরীফের দলিলের চেয়ে বেশী মূল্য রাখে না। তাই যে কোন ধর্মীয় মস্‌লা সমাধানে কোরআন করিমের দলিলই অগ্রগণ্য।" এতে করে সভায় উপস্থিত জনতা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের অনুসারীরা সভা পন্ড করার মানসে আহমদি মাওলানাদের উপর চড়াও হলো। তাদের মধ্যে একজন বাঁশ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মঞ্চস্থ টেবিলে আঘাত করলো। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব আঘাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নেওয়ায় আল্লাহর ফজলে মারাত্মক আঘাত পাওয়া থেকে বেঁচে গেলেন। প্রচন্ড হৈ-চৈ ও গন্ডগোল শুরু হয়ে গেলো। মাওলানা সাহেবরা যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে বাঁচলেন।

এই বহসের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে অত্র এলাকায় আরও অনেকে আহমদিয়া গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অনেকে পরবর্তিতে উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। মৌলভী আবু তাহের সাহেব তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দীর্ঘকাল আহমদিয়াদের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে গেছেন।[১৪]

হাদীসুল মাহদী

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কাজের কথা পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে নক্ষত্রের মতো

আহমদীয়তের আকাশে মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে তা হলো তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি "হাদীসুল মাহদী" গ্রন্থখানি। সে সময়ের বিরোধী মৌলভী রুহুল আমীন সাহেব কর্তৃক পাঁচ খন্ডে রচিত 'রদ্দে কাদিয়ানী' নামক পুস্তক লিখে বিরোধিতার যে ঝড় তুলেছিলেন, সে ঝড় সফলতার সাথে তিনি প্রতিহত করেছিলেন। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ৫ খন্ডের জবাব এক খন্ড 'হাদীসুল মাহদী' লিখে বিরাট প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। হাদীসুল মাহদী রচনা করতে গিয়ে যেভাবে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব উল্লেখ করেছেন, "তাফহীমাতে রব্বানীয়া" ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তক হতে সাহায্য নিয়েছেন।

এ পুস্তক প্রকাশিত হবার পর মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তা মৌলভী রুহুল আমীন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। তাকে ধর্মীয় বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দেন আর ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। শুনা যায়, মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব যখন মৌলভী রুহুল আমীনের নিকট পৌঁছান তখন তিনি মাওলানা সাহেবকে অনেক সমাদর করে বলেন, আপনি আমার এখানে তিনদিন মেহমান হিসাবে থাকুন। তারপর আপনার সাথে কথা হবে। কিন্তু মৌলভী সাহেব মাওলানা সাহেবের সাথে কোন কথা বলেন নি। তবে এরপর মৌলভী সাহেব আর কখনও কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি।

'হাদীসুল মাহদী' পুস্তকটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। দ্রুত এর সমস্ত কপি শেষ হয়ে যায়। এমন কি শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, ধার করেও পড়ার জন্যে তা পাওয়া দুষ্কর হয়ে গেল। যার নিকট এর কপি ছিল সে অন্য কাউকে এ পুস্তকটি দিতে অর্থাৎ হাতছাড়া করতে রাজী হ'ত না। জামাতের সুধীজন এ পুস্তককে মাওলানার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এমন অনেক বাঙ্গালী আহমদী বলেন, তারা কেবল এ বই পড়েই আহমদী হয়েছেন। পুরাতন আহমদীগণ এ পুস্তকটির গুণকীর্তন করে বলেন, তবলীগের ময়দানে এ পুস্তকটি ভীষণভাবে কাজে লাগে। অনেক সময় এ পুস্তকটি কয়েকজন মোবাল্লেগের কাজ করে। এ পুস্তকটি বহু দিন পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৯৯৬ সনে পুনঃ মুদ্রণের পর এখন আবার সহজলভ্য হয়ে নূতন রূপে নূতন আঙ্গিকে নূতন প্রজন্মের হাতে এসেছে।

মৌলভী রুহুল আমীন সাহেব পাঞ্জাবের আলেম কর্তৃক আহমদীয়তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদ ও আপত্তিকর বিষয়গুলো এ পুস্তকে একত্র করে ছিলেন। এ আপত্তিগুলো উত্থাপিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। এটা

আশ্চর্যের বিষয়, তিনি এ আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন; যদিও এসব আপত্তির উত্তর আব্দুর রহমান খাদেম সাহেবের "তবলীগী পকেট বুক", কাযী মুহাম্মদ নযীর সাহেব লায়েলপুরীর "আহমদীয়া পকেট বুক" এবং মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের "তাফহীমাতে রব্বানীয়া" পুস্তকে বিষদভাবে দেয়া হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় এমন কোন পুস্তক ছিল না যাতে এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছিল। এমন একখানা পুস্তক সাধারণ আহমদীর জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ছিল। মাওলানা সাহেব 'রদ্দে কাদিয়ানী' নামক পুস্তকের উত্তরে "হাদীসুল মাহদী" নামক পুস্তক রচনা করে এ প্রয়োজন পুরো করেন। তিনি মাওলানা আবুল আতা সাহেবের রচিত "তাফহীমাতে রব্বানীয়া"-এর অনুকরণে বিষদভাবে আপত্তিসমূহের উত্তর লিখেন। এ পুস্তক রচনা হওয়াতে এক সাধারণ বাঙ্গালী আহমদীর হাতে এমন একটি পুস্তক হস্তগত হলো যার মধ্যে সকল আপত্তির উত্তর একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় তবলীগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকের যে অভাব ছিল এ পুস্তক তার অভাব অনেকটা পূরণ করতে সক্ষম হ'লো। বহুলোক এ পুস্তক পাঠ করে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন।

"হাদীসুল মাহদী" ছাড়া মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব 'ইমাম মাহদী (আঃ) আর্বিভাব' ও 'হাদীসের দোয়া' নামে দু'টি পুস্তিকা রচনা করেন। তাছাড়া অনেক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। (তার রচিত ৩টি প্রবন্ধ এ পুস্তকের পরিশেষে দেয়া হয়েছে।)

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র

মধ্যম উচ্চতা, সুঠাম দেহ, চওড়া কপাল, বড় বড় আচ্ছাদনযুক্ত চোখ, রং কালো, দ্রুত হাঁটতেন। সাধারণতঃ সবুজ রং এর পাগড়ী পড়তেন। কখনো কালো রং এর গোলটুপি পড়তেন। বার্ধক্যে পাগড়ীর বোঝা সহ্য হত না। প্রায়ই হালকা টুপি পরিধান করতেন। সাধারণ পোশাক পরাতেন কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ইস্ত্রি করা। কোন অনুষ্ঠানে গেলে পোশাকের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় ও কুঁচ্‌কে না থাকে। প্রায়ই বলতেন কাপড় ভারি বা মোটা বা সাধারণ হওয়া দোষের নয় কিন্তু তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শোভনীয় হতে হবে। ধোপাকে দিয়ে কাপড় ধুইয়ে পড়তেন। অধিকাংশ সময় সফরে থাকতেন। নিজ আসবাবপত্র হালকা রাখার জন্যে বালিশের ন্যায় একটি ব্যাগ সেলাই করে নিয়েছিলেন যার মধ্যে ইস্ত্রি করা কাপড়-চোপড় রাখতেন এবং বেডিং এর মধ্যে সেই ব্যাগটা রেখে দিতেন। সফরের সময়ে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতেন যেন, ট্রেনের এমন স্থানে বসা যায় যেখানে তবলীগ করা যেতে পারে। জামাতের ব্যবস্থাপনায় যে শ্রেণীর টিকিট বরাদ্দ ছিলো সে শ্রেণীতেই ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কিছু বাঁচানো ঠিক মনে করতেন না।

একবার কোন এক সহজ সরল লোক এ কথা বলে ফেললো, আপনি যদি নিম্ন শ্রেণীতে সফর করেন তাহলে কিছু পয়সা বাঁচাতে পারেন। তিনি এ বিষয়টিকে অপছন্দ করলেন আর বল্‌লেন, উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণের অনুমতি দেয়ার উদ্দেশ্য হলো সে শ্রেণীর লোকদের সাথে সিলসিলার মুরব্বীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক। সিলসিলার মুরব্বীগণ যেন সম্মানের সাথে চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন।

বাংলাদেশে সড়ক ব্যবস্থা যা আজ দেখা যায় তা পূর্বে ছিলা না। তখন রেল ব্যবস্থা তত ভাল ছিল না। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। অনেক সময় নদীতেও সফর করতে হতো। মাওলানা সাহেব নৌকায় সফর করা পছন্দ করতেন। অধিকাংশ সময়ে নৌকায় চড়ে তবলীগের সফরে বেরিয়ে পড়তেন।

একদিন নয় বরং সপ্তাহের পর সপ্তাহ নৌকায় চড়ে গ্রামে গ্রামে তবলীগ করে বেড়াতেন। আর এ নৌকায় ভাড়া নেয়া হতো, নৌকাতেই খাবার প্রস্তুত হতো। নৌকাতেই আযান দিয়ে নামায পড়তেন। আর নৌকাতেই রাত্রি যাপন করতেন। একবার নৌকার মাঝি,যে হিন্দু ছিল মৌলবীরা তাকে বললো,যাকে তুমি নিয়ে ঘুড়ছো,সে তো কাদিয়ানী ও কাফের, তাকে নৌকায় নিও না। মাঝি বললো, আমি জানি না কাফের কাকে বলে। তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে মাননা কিন্তু এ ব্যক্তি শ্রী-

কৃষ্ণকে নবী বলে মান্য করে, আমাকে শ্রী-কৃষ্ণের ভালো ভালো কথা শুনায়। আমি তো তাকে ভগবানের অবতার মনে করি। যদি তিনি আমাকে বারণ না করতেন তবে আমি তাকে সিজদা করতাম।[১৫]

কুরআন করীমের প্রতি ভালবাসা

মাধুর্যময় কণ্ঠ, কুরআন সুন্দর করে পড়া এবং কুরআন শরীফের ভালোবাসা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কুরআনের প্রতি ছিলো তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। আল্লাহ্ তাঁকে যে মাধুর্যময় কণ্ঠ দান করেছিলেন আহমদীয়ত গ্রহণ এ গুণকে আরোও উজ্জ্বল করে দিয়েছিলো। মাওলানা জিল্লুর রাহমান ও সুফী মতিউর রহমান সাহেবের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁদের শুদ্ধ ও সুমিষ্ট কণ্ঠে তেলাওয়াতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। মরহুম মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, বহুবার আমাকে বলেছেন, আপনার পিতা খুব ভাল কুরআন পড়তেন আর আমার বোনদিগকে তিনি কুরআন পড়িয়েছিলেন। মালির কোটলা নিবাসী নবাব মুহাম্মদ আলী সাহেবের পরিবারের কয়েকজন সন্তানও তাঁর কাছে কুরআন পড়া শিখেছিলেন।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের কুরআন তেলাওয়াত বাংলাদেশের আহমদীয়তের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কিংবদন্তী হয়ে আছে। একবার বাংলাদেশের রংপুরে এড্যাভোকেট বদরুদ্দীন সাহেবের বাসায় জামাতের তরফ হতে জলসার আয়োজন করা হয়। বাসার আঙ্গিনায় জলসার মঞ্চ সাজানো হয়। অপরদিকে অ-আহমদী আলেমগণ বিরোধিতা শুরু করলেন এবং শহরের অবস্থা বিস্ফোরন্মুখ হয়ে গেলো। তারা এক রকম পিকেটিংই করে ফেললেন। জলসার সময় হয়ে গেলো, জলসাগাহ খালি পড়ে আছে, কয়েকজন আহমদীই শুধু বসে আছেন। বাইরের কেউ আসেন নি। এডভোকেট বদরউদ্দীন সাহেব চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন এবং বললেন কী করা যায়? মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব তাঁকে বললেন, আপনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে জলসা শুরু করে দিন।

অতঃপর জলসা শুরু করা হলো। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব একটি দীর্ঘ সূরার তেলাওয়াত শুরু করলেন। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর এবং কুরআন করীমের স্বকীয় সুর মাধুর্য উভয় মিলে এক অপূর্ব আবহ সৃষ্টি করছিলো। মানুষের সাধ্য কি যে, সে আল্লাহ্‌র কুরআনের সে মহিমান্বিত আহ্‌বানকে উপেক্ষা করে। রাস্তায় চলমান জনস্রোত থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং তন্ময় হয়ে তেলাওয়াত শুনতে লাগলো, সে মহিমান্বিত তেলাওয়াত। মাটি যেন তাদের চরণকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং তাদের কর্ণকুহরে অমৃতের ধারা। মাওলানা সাহেবের জাদুকরী কণ্ঠশৈলীর

তেলাওয়াতের আকর্ষণে লোকজন চারিদিক থেকে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে এ ভীড় বাড়তে লাগলো এবং এক সময় ভীড়ের চাপে এডভোকেট সাহেবের বাড়ির দেয়ালটি ভেঙ্গে গেল। একজন আহমদী গিয়ে তাদের বললো, আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভিতরে চলে আসুন। সুতরাং লোকজন ভিতরে চলে আসতে শুরু করলো যেন পতঙ্গ আশ্রয় নিলো আলোর প্রদীপের নীচে। প্রচুর লোক সমাগম হলো। তিনি তাঁর দীর্ঘ তেলাওয়াত শেষ করলেন এবং বক্তৃতা শুরু করলেন। চমৎকার এক সফল জলসা সম্পন্ন হলো।

ভীড়ের চাপে একটি সাইকেলও ভেঙ্গে গিয়েছিল। এডভোকেট বদরউদ্দিন সাহেব সাইকেলের মালিককে বললেন, আমি আপনাকে একটি নতুন সাইকেল কিনে দিই? এতে সাইকেলের মালিক উত্তরে বললেন, "সাইকেলের দামই বা কত! আপনাদের মৌলভী সাহেব যখন তেলাওয়াত করছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন আকাশ হতে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে। আমাদের মৌলভী সাহেবরাও কুরআন পড়েন। তাতে কোন আকর্ষণ থাকে না।[১৬]

মৌলভী আনওয়ার আলী সাহেব বর্ণনা করেন, "মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব যখন তেলওয়াত করতেন, মনে হতো যেন আকাশ হতে তারকা খসে পড়ছে। শ্রবণকারী হিন্দু হোক বা অন্য ধর্মাবলম্বী হোক না কেন বিস্ময়ে অভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত।"

এরূপ অনেকেই এ বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন যে, মাওলানার তেলাওয়াত শুনে মনে হতো যেন কুরআন আকাশ হতে অবতীর্ণ হচ্ছে। এরূপ বলা তেলাওয়াতকারীর আবেগ, অনুভূতি ও কুরআনের মধ্যে বিলীনতা প্রকাশেরই নামান্তর। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা কুরআন শরীফ এত তন্ময়ের সাথে পাঠ করতেন, মনে হতো যেন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছেন কুরআনের মধ্যে। সুরের মুর্চ্ছনা, কুরআনের ভালোবাসা ও এর মর্মবোধ মিলে তার তেলাওয়াতে এক অপার্থিব আকর্ষণের সৃষ্টি করতো।

আমি আমার পিতাকে তাঁর যৌবনে দেখি নি। প্রৌঢ়ত্বের সময় পিতার পিছনে যে নামায পড়েছি তাতে তিনি যত লম্বা সূরাই তেলাওয়াত করতেন না কেন নামায দীর্ঘ মনে হতো না। শৈশবেও পিতার পিছনে যখন নামায পড়তাম তখন পিতার সুমিষ্ট কণ্ঠের তেলওয়াতে নামাযে বেশ আনন্দ পেতাম। হৃদয়-মন যেন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠতো।

পূর্বেই বর্ণনা করেছি মাওলানা সাহেব হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা:)-এর দরসে কুরআন শুনেছেন। তিনি হাফেয রওশন আলী সাহেবের ছাত্র ছিলেন। কুরআন শরীফের সাথে তাঁর ছিল হৃদয়ের সম্পর্ক। কুরআন যেন ছিলো তাঁর

ভালোবাসার বস্তু। অবকাশের সময় অধিকাংশ সময়ে তিনি কুরআন পাঠ করতেন। সফরের সময়ে তিনি বিশেষভাবে বাঁধাইকৃত একখানা কুরআন নিজের কাছে রাখতেন। তাঁর কাছে তাজ কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত আর্ট পেপারে মাঝারী সাইজের কুরআন শরীফ ছিল। তিনি সেই কুরআন শরীফ খানা কাদিয়ানের এক পুস্তক বাঁধাইকারী যাঁর নাম সম্ভবত: আব্দুল্লাহ্ দিয়ে খুলে নিয়ে প্রত্যেক পাতার পর একটি বা দু'টি করে সাদা কাগজ লাগিয়ে চামড়া দিয়ে মজবুতভাবে বাঁধাই করিয়ে নিয়েছিলেন। এরূপ দু'খানা কুরআন সম্ভবতঃ তাঁর নিকট ছিল। একখানা বাঁধাই করতে আমি নিজে দেখেছি। অল্প বয়সের কারণে আমি বুঝতে পারি নি যে, শ্রদ্ধেয় পিতা কুরআন পাঠের সময় ঐ খালি পাতাগুলিতে নোট করতেন, নাকি অনুবাদ করতেন, নাকি যে সকল ব্যাখ্যা তাঁর মনে হতো তা লিখতেন। তিনি বলতেন, কুরআন শরীফ পাঠ করার সময় প্রত্যেক দিন আমি এমন নতুন বিষয় পেয়ে যেতাম যা এর পূর্বে আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল। তিনি এ-ও বলতেন, কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপমা ঢেউ এর ন্যায়। সাগরের ঢেউ যেমন একের পর এক আসতে থাকে, ঠিক তদ্রুভাবে কুরআনের বিষয়সমূহও ঢেউয়ের ন্যায় আমার মনে নতূন নতুন ভাবের সৃষ্টি করে। লেখাপড়া ও কুরআনের দরস দেয়া ছিল যেন তাঁর নেশা।

১৯৫৬ সনে আমি একবার বাংলাদেশে এসেছিলাম। তখন তাঁর স্বাস্থ্য এত দুর্বল ছিল যে, মনে করলাম তাঁর রোযা রাখা উচিত নয়। কিন্তু তিনি রোযা রাখলেন। ভাবলাম যখন তিনি রোযা রাখছেন, তখন স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁর কুরআনের দরস দেয়া উচিত নয়। তথাপি দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি সারাটা রমযান মাস প্রতিদিন এক পারা করে দরস দিয়েছেন। আমাদের জানতে চাওয়াতে তিনি বললেন, দরস দিলে আমি দুর্বলতা অনুভব করি না। দরস দেয়ার মধ্যে এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে, দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারত না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর তফসীরে কবীর-এর সাথে যেন তাঁর প্রেম ছিল। তফসীরে কবীরের খন্ডগুলো যখনই প্রকাশিত হত তখনই তিনি প্রথম সুযোগেই সেগুলো কিনে নিতেন। তফসীরে কবীরের প্রাথমিক ক্রেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি একে গভীর মনোযোগের সাথে পড়তেন। সম্ভবত: শেষ বয়সে কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি এক বা দু'পারার বেশি অনুবাদ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে সে অনুবাদের পান্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব কোন এক রমযান মাসে ঢাকায় ফজলুল করিম মোল্লার বাসায় পবিত্র কুরআনের দরস দিয়েছিলেন। তখন সূরা ফাতিহা তফসীরই করেছেন একবার সাত দিন।[১৭]

কিছু অলৌকিক ঘটনা

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব মুনাযারাতে (ধর্মীয় বির্তকে) অত্যন্ত সাহসী, ব্যাঘ্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় যেন খাপখোলা তরবারী।

এ কারণে কতিপয় ঘোর-বিরোধী তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। একাধিকবার তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

একবার একটি গ্রামে রাতের বেলায় বেড়ার ঘরে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। অকারণেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসলেন, দেখলেন, বেড়ার মাঝ দিয়ে ধারালো দা দিয়ে যেখানে তিনি শুয়েছিলেন সে জায়গায় আঘাত করা হলো। তিনি যদি সে জায়গায় শায়িত থাকতেন তাহলে দেহ থেকে মাথা পৃথক হয়ে যেত। কিন্তু মুহূর্তে পূর্বে উঠে বসে গিয়েছিলেন তাই আক্রমণকারীর দা'টি বালিশ টুকরো করে দিল।[১৮]

বাংলাদেশের উত্তরে বেলাকাবা নামক স্থান হতে চল্লিশ মাইল দূরের একটি গ্রাম। গ্রামের একমাত্র আহমদী ব্যক্তিটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ল। সেখানকার অ-আহমদী অধিবাসীরা বললো, "তুমি মরে গেলে তোমার জানাযা তো কেউ পড়বে না, তুমি তওবা কর এবং আহমদীয়ত ছেড়ে দাও।" সেই খোদার বান্দার দৃঢ়তায় কোন ফাটল ধরল না বরং উত্তর দিল আমার জানাযার চিন্তা করো না। আমার জানাযা পড়ার জন্য লোকেরা এসে যাবে। তোমরা শুধু বেলাকাবাতে গিয়ে আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে দিও। এ ঘটনাটি আমাকে আমার পিতা নিজেই বর্ণনা করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেন, বর্ষাকাল ছিল। আর রাস্তা এত খারাপ ছিল যে, সেখানে কারও পৌঁছান কঠিন ছিল। তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী সফর করতে করতে বেলাকাবাতে পৌঁছালেন। ঠিক ঐ সময়ে সেই আহমদীর মৃত্যুর খবর সেখানে পৌঁছায়। এভাবেই তিনি যথাসময়ে যথা স্থানে জানাযার জন্যে পৌঁছে যান।

মৌলভী আনওয়ার আলী সাহেব বলেন, তার শ্বশুর মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের কাছ হতে এ অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর নামাযে জানাযা পড়াবেন। ঐ দিনগুলোতে মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের শরীর খুব দুর্বল ছিল। আর শারীরিক অবস্থাও এমন ছিল না যে, তিনি কোথাও সফরে যেতে পারতেন। খোদার কি ইচ্ছা! মৌলবী আনওয়ার আলী সাহেবের শ্বশুর চিকিৎসার জন্যে নারায়ণগঞ্জে আসেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। আর এভাবে মাওলানা সাহেব নিজ অঙ্গীকার অনুযায়ী তার তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

মুজতাযাবুদ্ দাওয়াত (দোয়ার গ্রহণীয়তা)

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব বিগলিত চিত্তে দোয়া করার অধিকারী ছিলেন। সিলসিলার অতীতের বুযূর্গদের ন্যায় দোয়ায় মগ্ন থাকতেন। প্রায়ই তাঁর দোয়া গৃহীত হতো। দোয়া গৃহীত হবার অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়। এ দোয়া যেসকল ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান বৃদ্ধির কারণও হয়েছে।

মুকাররম এ.টি.এম. হক সাহেব পাকিস্তান আমলেকে সরকারী চাকুরী করতেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের নায়েব আমীরও হন। তিনি করাচীতে কর্মরত ছিলেন। একদা ষড়যন্ত্র করে কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা দায়ের করে। তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন, আমি বিগলিত চিত্তে মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে দোয়ার আবেদন করি। তিনি অঙ্গীকার করলেন, দোয়া করবেন। কয়েকদিন পর মাওলানা সাহেব আমার বাসায় আসলেন এবং বললেন, আমি দোয়া করেছি, উত্তরে বলা হয়েছে "Honourably Acquitted". ইনশাআল্লাহ আপনার স্বামী সম্মানের সাথে অব্যাহতি পাবেন। মিসেস হক বর্ণনা করেন, সম্ভবতঃ পরবর্তী দিনেই করাচী হতে হক সাহেব টেলিগ্রাম পান যাতে লেখা ছিলো Honourably Acquitted.[১৯]

এরুপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন আবূ আরেফ মুহাম্মদ ইসরাঈল সাহেব। তিনি বলেন, "তখন আমি প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছিলাম গোপনে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছাড়া এ কথা কেউ জানিত না। কিন্তু কীভাবে যেন হযরত মাওলানা সাহেব তাহা জানিতে পারেন। আমি পরীক্ষা দিয়া ফিরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন দেখিতে চান। আমি তাহাকে প্রশ্নপত্র দিলে জিজ্ঞাসা করেন, "১ম পত্রের কত উত্তর দিয়াছেন" আমি বলিলাম,"৯০ কিন্তু যা লিখেছি তাতে পাশ করার ভরসা নাই।" তিনি বললেন, "পঞ্চাশ পাবেন"। দ্বিতীয় পত্রে কত উত্তর দিয়েছেন। "আমি বলিলাম, মাত্র আশি। এ-ও যাচ্ছে-তাই খারাপভাবে" তিনি বলিলেন, "আটচল্লিশ পাবেন।" তিনি উভয় মার্কই প্রশ্ন-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন ও স্বাক্ষর করিলেন। আমি সন্দেহ প্রকাশ করিলাম, " এত মার্ক আমি পাইতেই পারি না।" কারণ ইংরেজীতে এত পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। তিনি বললেন, "রেজাল্ট আউট হোক, আপনি দেখবেন পান কিনা?" যথাকালে ফল প্রকাশিত হইল,দেখা গেল আমি একশ' এক মার্ক পাইয়াছি। তাহার হিসাব মত ৯৮ পাইবার কথা; আমি তিন বেশি পাইয়াছি কিন্তু কম পাই নাই। আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় বান্দার দোয়া কীভাবে পূরণ করেন তাহা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হইতে

দেখিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে আর ভাবিয়াছি সে বৃদ্ধ অসহায় লোকটা আল্লাহ্‌র কত প্রিয়। ক্ষুদ্র একটি বৈদ্যুতিক তার কতই না তুচ্ছ,কিন্তু যখন উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন এক মস্ত হস্তীকেও নিমেষে ধরাশায়ী করে; তেমনই আল্লাহর সহিত্ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির দোয়া ও অসাধ্য সাধন হবে।"[২০]

আমাদের সিলসিলার যুবক মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, "মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব আমার মাকে বোন বলে সম্বোধন করতেন। সফরে একবার তিনি আমাদের গ্রামে যান। সে সময়ে তিনি আমার মাকে বললেন, যদি কোন বিশেষ দোয়া করাতে চাও তা করিয়ে নাও। সম্ভবত:সে সন্তানের জন্যে দোয়া করবেন"। মাওলানা বললেন, আচ্ছা আমি দোয়া করবো। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে এমন ছেলে সন্তান দিবেন যে খাদেমে দীন হবে।"[২১]

মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, "এরপর আমার জন্ম হয় এবং আল্লাহ্‌র ফযলে আমি এখন ধর্মের সেবা করার তৌফীক পাচ্ছি। আমি আমার পিতার দোয়ার সাথে মাওলানারও দোয়ার ফল।"এটাও আশ্চর্যজনক, সালেহ আহমদ সাহেব জামেয়া আহমদীয়ার যে ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি ব্যতীত সে ব্যাচের অধিকাংশ ছাত্র কোন না কোন কারণে শিক্ষা পূর্ণ করতে পারেন নি।

হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ)-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা

মাওলানা সাহেব যৌবনে হিজরত করে কাদিয়ানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর জন্যে তাঁরা গভীর ভালোবাসা ছিল। হুযূর (রাঃ) এর বক্তৃতা ও খুতবাসমূহকে শুনা ও মনে রাখার এমন ঝোঁক ছিল যে, ছোট বেলায় আমার জন্য তা আজব ব্যাপার ছিল। মাওলানা সাহেব নিজ জীবনের শেষ দিকে কয়েকটি জলসায় যোগদান করতে পারেন নি। ১৯৫৬ সনে আমি যখন বাংলাদেশে এসেছিলাম তখন তিনি আমার কাছে থেকে বিস্তারিতভাবে জলসার অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করেন। বিশেষ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর জলসার বক্তৃতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে বললাম, হুযূর "সয়েরে রূহানীর" ওপর আবার ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় তাঁর উৎকণ্ঠা ও অনুভূতি দেখার মত ছিল। তিনি আমার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন, আমি যেন ফেরৎ গিয়ে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বংশধরদের ছোট হোক বা বড় সবার সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করি। একবার কাদিয়ানে ছুটিতে ছিলেন। এ ঘটনাটির সময়ে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। মসজিদে মোবারকের নীচের রাস্তায় আমাদের যাবার সময় সাহেবযাদা মির্যা নাসের

আহমদ সাহেবের সাথে দেখা হয়। তিনি তাঁর সাথে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতঃ সাক্ষাৎ করলেন আমার বয়স অল্প হবার কারণে তা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। এখন চিন্তা করলে মনে হয়, এটা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খানদানদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে ছিল অথবা মাওলানা সাহেব হুযূরের ভবিষৎ মর্যাদার প্রতি কোন ঐশী খবরও পেয়ে থাকতে পারেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অনুরূপভাবে নিজ জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন তখন তিনি ওসীয়ত করেছিলেন আমার মৃত্যু যদি এখানে হয় তাহলে সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব যেন আমার জানাযার নামায পড়ান। সাহেবযাদা সাহেব তখন নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স-এর সম্ভবত সভাপতি ছিলেন। একদা আমাকে বললেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'মাহমুদ কি আমীন' নামক কবিতা যে দোয়া করেছেন তা কখনও বৃথা যেতে পারে না।

আমি পরবর্তীতে জানলাম, হযরত সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াককুল ও খোদার সাথে সম্পর্কের দিক হতে অনেক উচ্চ মার্গের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুতরাং খোদার কি ইচ্ছা! মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের মৃত্যুর সময় হযরত সাহেবযাদা সাহেব ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঢাকাতেই মাওলানা সাহেবের জানাযা নামায পড়ান। মাওলানা সাহেবের মৃত্যুর সময় ঢাকার একজন বুযূর্গ মহিলা, যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাঙ্গালী সাহাবী হযরত রইসউদ্দীন খান সাহেবের পরিবারের সদস্য ছিলেন স্বপ্নে দেখেন একটি শিশুর জানাযা দোলনায় পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করাতে বলা হয় ইনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বংশের কোন শিশু।[২২]

একজন আদর্শ শিক্ষক

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের চরিত্রে একজন আদর্শ শিক্ষকের সমস্ত গুণ ছিলো। তাঁকে যারা জানেন তারা সবাই তাঁর সহজ সরল-জীবন যাপন ও যুবকদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। আমাদের সিলসিলার পুরাতন বুযূর্গদের মাঝে এ সমস্ত গুণও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের প্রশিক্ষণে যারা মুয়াল্লেম হয়েছেন এবং যে সমস্ত যুবক তরবিয়ত পেয়েছেন তাদের সবারই একই প্রতিক্রিয়া ছিল।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব বাংলাদেশের প্রথম মুয়াল্লেম ক্লাস পরিচালনা করেন। তার ক্লাসের বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব, মুহাম্মদ মনোয়ার আলী সাহেব, খন্দকার সালাহ উদ্দিন সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণগঞ্জ নিবাসী মৌলভী আনওয়ার আলী সাহেবও তাঁর নিকট আরবী শিখেছেন। তিনি বলেন, "মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বলতেন, যে ব্যক্তি একটি ভাষা ভালোভাবে জানে সে আরেকটি ভাষা সহজেই শিখে নিতে পারে। যেহেতু তুমি বাংলা এবং ইংরেজী জানো তাই তুমি সহজে আরবী আয়ত্ত করতে পারবে। তোমাকে আমি আরবী ভাষা শেখাতে পারি"। আমি এমন একজন শিক্ষকের সন্ধানেই ছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ কীভাবে তাঁর কাছে আরবী শিখতে রাজি হয়ে গেলাম। আমি কলেজে পড়তাম সে সময়েই মাওলানা সাহেব আমাকে আয়নায়ে কামালতে ইসলামের আরবী অংশ পড়াতে শুরু করেন। আমি তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী ঈদগাহে প্রতি রোববার ও অন্যান্য ছুটির দিনে পড়তাম। তিনি আরবী এমন আর্কষণীয়ভাবে পড়াতেন যে, শীঘ্রই আমি আরবী ভাষা শিখতে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। তিনি আরবী বাক্যের অনুবাদ করতেন অতঃপর প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে বোঝাতেন। এর সাথে ব্যাকরণ বিষয়টিও বুঝাতেন। আজ এত বছর অতিবাহিত হবার পরও তাঁর শিখানো একটি আরবী পংক্তি মনে আছে যা তিনি " নূনে ছাকিলা" ব্যবহার করে পড়িয়েছিলেন।[২৩]

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ছাত্রদের মনস্তত্ত্বের দিকে খেয়াল রাখতেন। একজন কিশোর বয়সের ছাত্রকে কীভাবে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হয় তা তিনি ভালই জানতেন।

একদিন আমাকে নামাযে অলস এবং পড়ার দিকে ঝোঁক দেখে, বললেন, তোমাকে একটি ওযীফা বলে দিতে পারি, যদ্বারা তোমার স্মরণ শক্তি বাড়বে এবং সমস্যার সমাধান হবে। তিনি বললেন, প্রতি বেলা ফরয নামাযের পরে এগারো বার ففهمنا ها سليمان **"ফা ফাহ্‌হামনা সুলেইমানা"** পড়বে যা ক্রমাগত চল্লিশ দিন করতে হবে। একটি শর্তও আছে যে, কোন নামায যেন বাদ না যায়। নামাযের প্রতি মনোযোগী করার জন্য এ ছিল তার তরবিয়তের ধরন। বাচ্চাদের নামায ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কখনও কঠোরতা অবলম্বন করেন নি। ছোটবেলায় আমি কাদিয়ানে ছিলাম। সে সময় মাগরিব নামাযের সময় খেলাধূলায় মগ্ন থাকতাম। এজন্য মাঝে মাঝে তাঁর নিকট মার খাওয়ার কথাও আমার মনে আছে। এ ছাড়া পড়ালেখা বা অন্য কোন কারণে আমাকে তিনি মারধর করেছেন বলে মনে পড়ে না।

আমার মেট্রিক পরীক্ষা শেষ। একদিন চিনিউটের বাজারে বিরুদ্ধবাদীদের একটা বই "কাদিয়ানী নবুওয়ত" আমার হাতে পড়লো। আমি কাদিয়ানে থাকার সময় এ ধরনের বই পড়ি নি। পড়ে দেখলাম, বইটি অকথ্য ভাষায় ভরা। আমি আব্বার নিকট বইটি দিলাম এবং এর মধ্যকার প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলাম।

তিনি সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমার সামনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর বই এর এক ভান্ডার খুলে দিয়ে বল্লেন, এর মঝে তোমার সব প্রশ্নের জবাব আছে, জেনে নাও। কোথাও না বুঝলে আমার কাছে বুঝে নিবে। আমাকে আরও বল্লেন, উত্তরগুলো লিখে নিতে। এমনি করে মেট্রিক পরীক্ষার পর আমার অলস মুহূর্তগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে দিলেন। সে সময় আমি রীতিমত একখানা বই লিখে ফেলেছিলাম। আমি তখন থেকেই আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রায় অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর জেনে যাই। আহমদী হিসাবে আমার যেন নব-জন্ম হলো। আমি যেন নূতন করে আহমদীয়তে বয়াত হলাম। আব্বার সহযোগিতায় সে সময় যা কিছু শিখেছি তা পরবর্তী জীবনে আমার বেশ কাজে এসেছে। আমার জীবনের উন্নতির সোপান হয়েছে।

শিক্ষকদের মাঝে কেউ কেউ এমন আছেন যারা নিজে ছাত্রদের বিষয় বস্তু খাতায় লিখে বুঝিয়ে দেন আর কেউ কেউ এমন আছেন যারা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের দ্বারা কাজটি করিয়ে নেন। আমার আব্বা ছিলেন দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষক।

চিনিউট থাকাকালীন সময়ে একবার তিনি আমাকে কোন একটি কাজ করতে দিয়েছিলেন। আমি সে কাজটি করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময়ে আমাকে কাজের কথাটি জিজ্ঞেস করলেন। আমি ভুলে যাবার কথা বললাম। উত্তর শুনে তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো। শেরওয়ানীর বোতাম লাগাতে লাগাতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। যাবার সময় আরবী এ পংক্তিটি আওরালেন

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ
لِاَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنْ اِلٰهٍ وَنُوْرُ اللّٰهِ لَا يُعْطٰى لِعَاصِىْ

"একজন বিজ্ঞজনের নিকট আমি আমার মন্দ স্মরণ শক্তির কথা বললাম। তিনি আমাকে নসীহত করলেন, আমি যেন গুনাহ্ করা ছেড়ে দিই"। আব্বা জানতেন, আমি এতটুকু আরবী বুঝি। কারণ, সে দিনগুলোতে তিনি আমাকে আরবী শিখাচ্ছিলেন। আমাকে লেখাপড়ায় গাফেল দেখলে নসীহত করতেন। আর লেখা পড়ায় ভালো বিষয় দেখলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নযম "নও নেহালানে জামাত সে খেতাব" হতে পড়ে শুনাতেন।

তরবিয়তের জন্যে তিনি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি একবার আমাকে বললেন, আমি যদি আরবী নহব এর মাহে আমল যা কবিতার রূপে নাহব এর পুস্তকে লেখা আছে মুখস্থ করে শুনিয়ে দিই তাহলে তিনি আমাকে

একটি পার্কার কলম (যা সে যুগে অত্যন্ত দামী কলাম ছিল) পুরস্কার দেবেন। আমি যথারীতি আরবী নহব-এর মাহে আমল মুখস্ত করে সে পুরস্কার পেয়েছিলাম।

একদিন বললেন, যে ব্যক্তি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাসীদা يَا عَيْنَ فَيْضِ اللّٰهِ وَالْعِرْفَانِ "ইয়া আইনা ফায়যিল্লাহি ওয়াল ইরফানী" মুখস্থ করবে তার স্মরণ শক্তিতে বরকত দেবার সুসংবাদ দেয়া আছে। যদি চাও, তোমার স্মরণ শক্তি ভালো হোক তাহলে এ কাসীদাটি মুখস্থ করে নাও। এভাবে আমি দশম শ্রেণীতে থাকাকালীন সময়ে এ কাসীদাটি মুখস্থ করার সুযোগ পাই।

চিনিউটে থাকাকালীন সময়ে তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্রদেরকে নিজের কাছে রাখতেন। তাদের রীতিমত তবলীগী নোট দিতেন এবং বলতেন, প্রত্যেকটি দলিল খুব ভালো করে মুখস্থ করে নাও। মোবারক মুসলেহ উদ্দিন সাহেব এবং মোকারম ডাঃ শফীক আহমদ সাহেব সেহগাল, মুলতান জামাতের আমীর বর্ণনা করেন, মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কিছু দিন এভাবে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল বুঝিয়েছিলে যে, তা আজ পর্যন্ত আমার মনে আছে ও আশা করি অন্যান্য বন্ধুরও তা মনে আছে।

আমাদের ফুফাতো ভাই মোকাররম মুসলেহ উদ্দিন খাদেম তখন কাদিয়ান তা'লীমুল ইসলাম কলেজে পড়েন। মাওলানা সাহেব তাকে আরবী পাঠ্য-পুস্তক থেকে 'ত্বফুর আযার', 'সাবআ মুআল্লাকা', 'মুতানাব্বি' ইত্যাদি বুঝাতেন।

আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেবের চার পুত্র

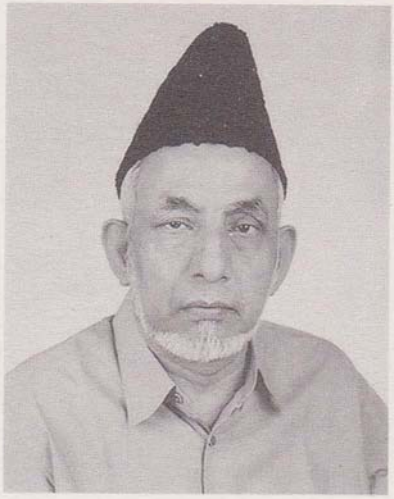

আতাউর রহমান

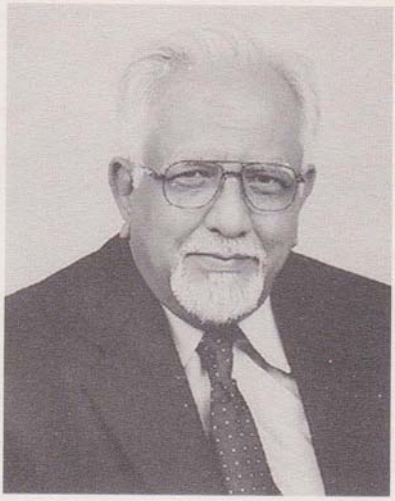

মুজীব-উর-রহমান

ছাইফুর রহমান

হামিদুর রহমান

পরিবার-পরিজন

ধর্মকে সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়াই ছিলো আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেবের জীবনের মূল-মন্ত্র। তাঁর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কাদিয়ানে প্রশিক্ষণ চলা কালে তিনি একবার বাংলাদেশে আসেন। বাসুদেব নিবাসী মৌলভী হায়দার আলী একজন পন্ডিত ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব জনাব হায়দার আলী সাহেবের বড় মেয়ে উম্মুল হেদায়া সালেহা খাতুনকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রামের আহমদীয়তের আত্মনিবেদিত দু'টি পরিবার বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত হলো।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব আহমদীয়তের শিক্ষায় ও কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবার কাদিয়ানে নিয়ে আসেন।

আমার মা ১৯৩৪ সনে কাদিয়ানে আসেন। আর কখনও দেশে ফিরে যান নি। সন্তানদের তরবিয়তের জন্য কাদিয়ানে থেকে যান। ভাই-বোনদের জন্য এটা এক অতীতের ঘটনা হয়ে গেছে। কাদিয়ানে থাকাকালীন অবস্থান, নিরাপত্তা, শান্তি ও সুখ সবই ছিল। সন্তান কাদিয়ানে শিক্ষা পাচ্ছিল মূল উৎস থেকে। তবে আমার মার তার ভাই-বোনদের প্রতি টান কখনও স্তিমিত হয় নি। এ ভালোবাসাকে সন্তানদের জন্যে সর্বদা ত্যাগ করে আসছিলেন। দৈহিক সর্ম্পকের মোকাবেলায় সর্বদা ধর্মীয় ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি পাঞ্জাবী ভাষা জানতেন না। তবে দীর্ঘদিন থাকার কারণে পাঞ্জাবী ও উর্দূ ভাষা বুঝতে পারতেন। তবে বলতে পারতেন না। সামাজিক পার্থক্যও ছিল। তাই দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া অন্যান্য সম্পর্ক ব্যাপক ছিল না। দেশ হতে দূরে থাকার কষ্ট ও নিঃসঙ্গতার অনুভূতি সর্বদা বিদ্যামান ছিল। সন্তানদের প্রায়ই বলতেন, তোমাদের জন্য এখানে থেকে গেছি। তিনি ওসীয়তকারী ছিলেন এবং সিলসিলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। তিনি বেশি লেখাপড়া জানতেন না। কুরআন শরীফ পড়তে পারতেন। আর যতক্ষণ স্বাস্থ্য ভালো ছিল নিয়মিত তেলওয়াত করতেন। উর্দূ পড়তে পারতেন না। তবুও আল্ ফযলের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এটা পড়তে চেষ্টা করতেন অথবা সন্তানদের দ্বারা পড়িয়ে শুনতেন। দেশ বিভাগের সময় আমাদের পরিবার কাদিয়ান হতে হিজরত করে চিনিউটে চলে আসে। রাবওয়াতে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা ছিল। এজন্যে হিজরতের পরও মাতৃভূমিতে ফিরে যান নি। সে সময়ে রাবওয়া আবাদ হয় নি। তাই কিছুদিনের জন্য

আমাদের পরিবার চিনিউটে অবস্থান করে। এখানেই আমাদের মা ১৯৫১ সনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি বেহেশ্‌তি মকবেরাতে সমাধিস্থ হন। সে সময়ে আমার পিতা পূর্ব বাংলায় ছিলেন। মৃত্যুর খবর শুনে রাবওয়াতে আসেন। আমর পিতা সন্তানদের আমার মায়ের কাছে রেখে নিশ্চিত ছিলেন। কখনও চিন্তা করেন নি। কিন্তু আমার মায়ের মৃত্যুর পর তার চিন্তা যেন দু'গুণ বেড়ে গেল। সন্তানদের ব্যাপারে এত আবেগপ্রবণ হয়ে পরেন যে, তাদের কাছ থেকে পৃথক থাকা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। সুতরাং তিনি কেন্দ্রে অনুরোধ করেন যেন সন্তানদের বাংলায় তাঁর কাছে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে আমাদের পরিবার পাঞ্জাবের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও আবার বাংলায় ফিরে আসে। আমি ঐ সময়ে বিমান বাহিনীতে ভর্তি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে যাই। পরবর্তীতে সেখানেই আমার পেশা জীবন সেখানে শুরু করি।

আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেবকে আল্লাহ্‌তাআলা দশজন সন্তান-সন্ততি দান করেন। এদের মধ্যে দু'কন্যা শৈশবেই মারা যায় আর আটজন বেঁচে থাকে; যাদের চার কন্যা ও চার পুত্র বয়:প্রাপ্ত হন। এদের মধ্যে চার মেয়ে ও তিন ছেলে জীবিত আছেন। বড় মেয়ে হাবীবা আক্তার সাহেবার বিবাহ মোকার্‌রম ও মোহতারম মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ্‌ সাহেবের সাথে হয়। তিনি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন। হাবীবা আক্তার সাহেবাকে আল্লাহ্‌তাআলা চার কন্যা দান করেন। এদের এক কন্যা শাহানার বিবাহ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেবের সাথে হয়। মাওলানা সাহেব বর্তমানে সদর মুরব্বী হিসেবে চট্রগ্রামে কর্মরত আছেন। মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর বড় ছেলে মোকার্‌রম মাহমুদ আহমদ সাহেব, প্রাক্তন সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতে খেদমতে দীন করে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়া কন্যা হাসিনা ফারহাত সাহেবার বিবাহ বগুড়া নিবাসী মোকররম আব্বাস আলী মোক্তার সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মাষ্টার জহুরুল হক সাহেবের সাথে হয়। তার ঘরে পাঁচ মেয়ে এবং এক ছেলে।

দুই মেয়ের পর মাওলানার বড় ছেলে আতাউর রহমান সাহেব। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌড়াইল মীর বাড়ির মীর আব্দুল জলিল সাহেবের বড় মেয়েকে বিবাহ করেন। আল্লাহ্‌র ফযলে আতাউর রহমান সাহেবের পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে। পুত্র সন্তানের দিক হতে আমি দ্বিতীয়। আমি বর্তমানে পাকিস্তানে সুপ্রীম কোর্টে এডভোকেট। শুধু মাত্র আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এবং পিতার দোয়ার ফলে আঠারো বছর রাওয়ালপিন্ডি জামাতের আমীরের দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। হুযূরের স্নেহের দৃষ্টির কারণে জামাতের অন্যান্য কিছু কাজ যথাসাধ্য করে যাচ্ছি। তাছাড়া পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টে জামাতের বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমায় জামাতের আহমদীয়ার পক্ষে উকালতি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এটা আমার পেশাজীবনের চরম সার্থকতা বলে আমি মনে করি।

তবে আমি নিজের মধ্যে এর জন্য এমন কোন বিশেষ যোগ্যতা আমি দেখছি না।

اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى

বড় চাচা মৌলবী বজলুর রহমান সাহেবের তৃতীয় মেয়ে যিনি পীর মাযহারুল হক সাহেবের নাতনী, তার সাথে আমার বিবাহ হয়। খাকসারকে আল্লাহ্‌তাআলা তিনটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। বড় ছেলে আজিজুর রহমান ওয়াকাস একজন এডভোকেট ও আমার সহযোগী। গুজরাতের রিটায়ার্ড স্কোয়ার্ডন লিডার চৌধুরী মুনির আহমদ সাহেবের ছোট মেয়ের সাথে তার বিবাহ হয়। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। আমার দ্বিতীয় ছেলে আতাউর রহমান মায। সে লাহোরের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী শেখ মুনীর আহমদ সাহেব সেসন জজ এর কন্যাকে বিবাহ করেছেন। সে একজন ডাক্তার এবং যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে চাকুরীরত। ডাক্তার মায-এর দুই ছেলে। খোদাতাআলা আমার জীবনেই চার নাতী এবং একটি নাতনী দান করেছেন। তৃতীয় ছেলে খলীলুর রহমান হাম্মাদ। সে ইসলামাবাদ-এ বি.বি.এ (সম্মান) পাশ করেছে। সে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত আছে। সে তিন সপ্তাহের জন্য আসীরে রাহে মাওলা (আল্লাহ্‌র জন্যে কারাবন্দী) হবার সৌভাগ্য অর্জন করে ছিলো।

আমার প্রথমা স্ত্রী ইন্তেকার করেন ২০০০ সাল। আমি পুনরায় ২০০২ সালে মসিহ মাউদ (আঃ) এর সাহাবী ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি জনাব সৈয়দ বশীর আহমদ শাহ সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করি।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের তৃতীয়া মেয়ের নাম আয়েশা ইশরাত। তার বিবাহ হয় হোমিও ডাঃ ফযলুর রহমান সাহেবের পুত্র মাশহুদুর রহমানের সাথে। মাশহুদুর রহমান সাহেব ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। তার দুই কন্যা সন্তান আছে। প্রথম কন্যার বিবাহ হয় ফাজিলপুর নিবাসী জনাব ইসমত পাশার সাথে। সে বর্তমানে স্বামীর সাথে কানাডায় অবস্থান করছে। তার দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। জনাব ইসমত পাশা কানাডা জামাতের একজন নিষ্ঠবান কর্মী। বেগম আয়শা ইসরাতে দ্বীতিয় মেয়ের বিবাহ হয় চট্টগ্রাম নিবাসী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর ছেলে রফিউজ্জামান চৌধুরীর (লিটন) সাথে। তার দুমেয়ে এক ছেলে। সবাই আল্লাহর ফজলে জামাতের সাথে ভালো সম্পর্ক করে।

চতুর্থ মেয়ে সাদেকা মুসাররাতের বিয়ে হয় এ.টি.এম. হক সাহেবর ছোট ভাই মুনীরুল হক সাহেবের সাথে। তার পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে। স্নেহের সাদেকা মুসাররাত লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার এক তেজস্বীণী কর্মী। আল্লাহ্‌র ফযলে তার সকল সন্তানরা সাধ্যানুযায়ী সিলসিলার খেদমত করে।

মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের তৃতীয় পুত্র ছিলেন মরহুম সাইফুর রহমান। তিনি দেবগ্রাম নিবাসী বিখ্যাত চৌধুরী মোজাফ্ফর উদ্দিন সাহেবের ভাতিজীকে বিবাহ করেন। সাইফুর রহমান যৌবনেই এক পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তার পুত্র লতিফুর রহমান লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে মামার তত্ত্বাবধানে ইটালিতে কর্মরত আছে।

ভাই হামিদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম পাশ করেছেন এবং ঢাকায় বেসরকারী চাকুরীরত আছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌড়াইল মীর বাড়ির মীর আব্দুল জলিল সাহেবের ছোট মেয়েকে বিবাহ করেন। খোদাতাআলা তাকে তিন পুত্র সন্তান দিয়েছেন। তারা সবাই লেখাপড়া করছে।

সুখ ও দুঃখ, সাথর্কতা ও ব্যর্থতা উত্থান-পতন জীবনের অংশ। এর উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। মানুষ এ ব্যাপারে সর্বদাই আল্লাহ্‌র ফযলের উপর নির্ভরশীল। আমাদের মাতা-পিতা তাদের সাধারণ হাসি-আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাদের সন্তানরা এবং ভবিষৎ প্রজন্ম যেন ভাল আহমদী হিসাবে গড়ে উঠে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের ত্যাগ গ্রহণ করুন এবং তাদের নেক আকাঙ্খা পূর্ণ করুন।

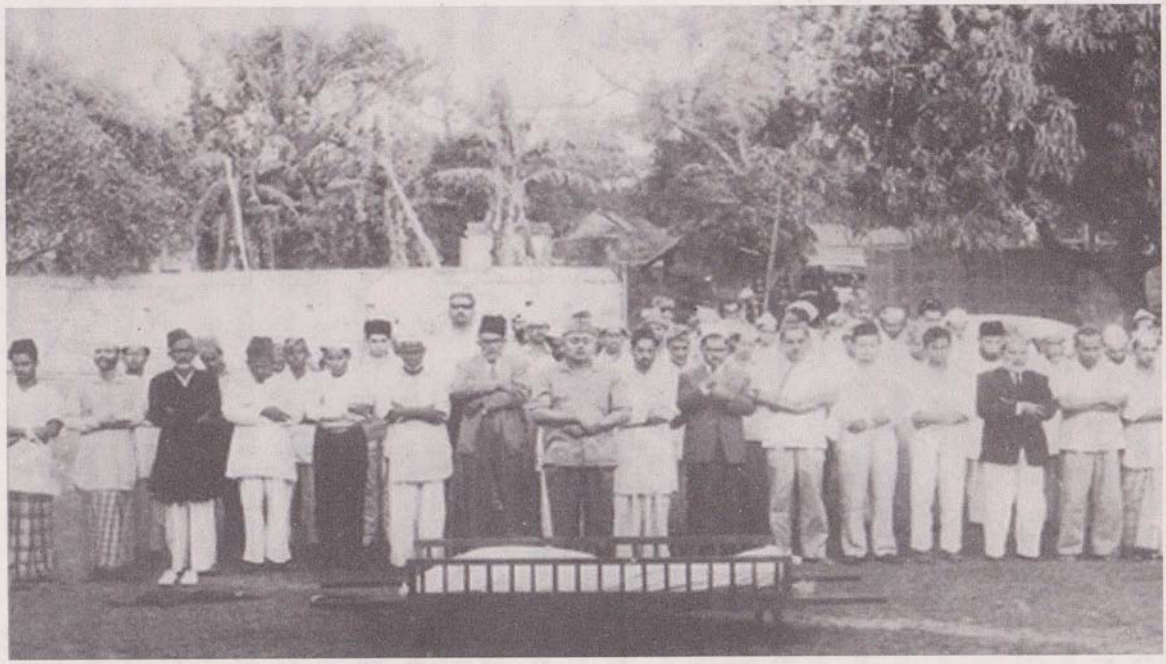

আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব-এর জানাযা পড়াচ্ছেন হযরত মির্যা জাফর আহমদ সাহেব।
ছবিতে অন্যান্যদের মধ্যে প্রথম সারিতে দন্ডায়মান ঃ ডাঃ মোহাম্মদ মুসা, আহসান উল্লাহ সিকদার, ফজলুল করিম মুল্লা, আব্দুর রশিদ (নারায়নগঞ্জ), খলিলুর রহমান খাদেম, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, আব্দুস সালাম, শেখ জাফর আহমদ, এডভোকেট দৌলত আহমদ খাদেম, আবুল হোসেন (নারায়নগঞ্জ) প্রমুখ।

মহা প্রস্থান

১৯৬৪ সালের মার্চ মাস। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের বয়স প্রায় সত্তর বছর। অনেক পূর্বেই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে জলসায় তিনি ভালভাবে বক্তৃতা করতে পারেন নি। এ প্রসংঙ্গে আবূ আরেফ মোহাম্মদ ইসরাঈল বলেন, সাধারণত: মাওলানা যখন বক্তৃতা করতেন, অতি দূরের শ্রোতারাও মন্ত্র মুগ্ধের মতো শুনতো। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ মাইকের আওয়াজকেও হার মানাতো।

কোন একজন শ্রোতা বললেন, "ষাট বৎসর বয়স তখনও পূর্ণ হয় নি অথবা অতিক্রান্ত হলেও সে বয়সে মানুষ বেশি দুর্বল হয় না। কিন্তু আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব দুর্বল হয়ে পড়লেন" ? তার একথা শুনে পাশে উপবিষ্ট মাওলানা মমতাজ সাহেব মন্তব্য করলেন, "আমরা বয়সের এত হিসাব করে চলি না"। মাওলানা মমতাজ যথার্থ বলেছিলেন। মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব জীবনের সময়ক্ষণ হিসাব করে চলেন নি।

১৯৬৩ সালে একবার আমার বড় ভাই আতাউর রহমান আমাকে লিখলেন, আব্বার শরীর বেশি ভাল যাচ্ছে না, আমি যেন একবার এসে দেখে যাই। আমি তখন রাওয়ালপিন্ডিতে ছিলাম। আমার প্রাকটিস সবে শুরু করেছি। যা হোক আমি ঢাকায় এলাম এবং আব্বার সাহচর্যে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলাম। এটা ছিল আমার আব্বার সাথে শেষ দেখা।

তিনি প্রায়ই বলতেন, "জুমুআর দিন সন্ধ্যায় বাইরে থাকবে না। আমি যখনই যাই জুমুআর দিন সন্ধ্যা বেলাতেই যাবো"। তিনি বলতেন, "আতাউর রহমান আমার জানাযা নিয়ে সারা রাত বসে থাকবে"।

মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের সন্তানগণ অবাক বিস্ময়ে তাঁর বর্ণনার হুবহু সত্যতা প্রত্যক্ষ করলো। ১৯৬৪ সনে ৬ই মার্চ জুমুআর দিন সন্ধ্যায় মাগরিব নামাযের কিছুক্ষণ পর তিনি কাউকে কিছু না বলে নীরবে অতি নীরবে ইহলোক ত্যাগ করে স্বীয় মাওলার সান্নিধানে মহা প্রস্থান করলেন। মাওলানার তৃতীয় ছেলে সাইফুর রাহমান স্কুলের পড়া তৈরী করছে। তিনি তার ইংরেজি পড়া ঠিক করে দিলেন। শীতের সন্ধ্যা ছিল। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটু পরে তার তৃতীয় মেয়ে আয়শা সান্ধ্যা কালীন চা-নাস্তা নিয়ে তাঁকে ডাকতে এলো। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সাধারণত: তিনি প্রথম ডাকেই সারা দিতেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে আয়শা আর তাঁকে বিরক্ত করলেন না। কিন্তু সে ভাবতেও পারে নি যে, তার পিতা চির নিদ্রায় শায়িত। বড় ছেলে আতাউর রহমান বাইরে ছিলেন। সেদিন তার বাসায় ফিরতে বিলম্ব হয়েছিল। ভাই আতাউর রহমান আস্‌লে সকলের সাথে রাতের খাবারের জন্য আবার ডাকা হ'ল। কিন্তু এবারও

তিনি কোন সারা দিলেন না। আতাউর রহমান ডাক্তার আনতে দৌড়ালেন। ডাক্তার সামাদ সাহেব তখন নারায়ণগঞ্জে থাকতেন। তিনি এসে দেখে বললেন, মাওলানা সাহেবতো ঘুমন্ত অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মাওলানা সাহেব যেন তাঁর মহা প্রস্থানের দৃশ্যাবলী পুর্বেই অবলোকন করেছিলেন। সন্তানদের কাছে পূর্বে যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঠিক সেভাবেই ধরাধাম থেকে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে প্রস্থান করলেন।

পরের দিন সকালে জানাযার জন্য মরদেহ দারুত তবলীগে ৪নং বকশী বাজারে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাদের জন্য আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জানাযার নামায যেন মির্যা জাফর আহমদ সাহেব পড়ান। সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব সেই দিনগুলোতে নারায়ণগঞ্জে থাকতেন এবং তিনিই নামাযে জানাযা পড়ান। জানাযার পর দাফন করার ব্যাপারে জামাতেরই অনেকই তাদের মত ব্যক্ত করলেন যে, মরহুমকে দারুত তবলীগের চার দেয়ালের মাঝে দাফন করা হোক। ঢাকার সাধারণ কবরস্থানগুলোতে কবর সংরক্ষিত থাকে না। কারণ, চল্লিশ বছর পর সে কবরগুলোর ওপর অন্য কবর দেয়া হয়। জামাতের বন্ধুদের প্রত্যাশা ছিল, মাওলানার অসাধারণ খেদমত ও ব্যক্তিত্বের দরুন তাঁর কবর সংরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোকার্‌রম আমীর সাহেব ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টি রেখে এই মত পোষণ করেছিলেন যে, দারুত তবলীগের চার দেয়ালের মধ্যে দাফন করা সঠিক হবে না। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হলো আজীমপুর গোরস্থানে কবরের জায়গা ক্রয় করে নিলে কবর সংরক্ষিত হয়ে যাবে। কবরের জমি ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করে জানা গেল এতে যা খরচ হবে তাতে করে প্লেন যোগে মরদেহ রাবওয়ায় পৌঁছানো যাবে। সন্তানদের কারোরই সামর্থ্য ছিল না যে, মৃতদেহ রাবওয়ায় নিয়ে যাবার চিন্তা করে। খোদাতাআলা মরহুমের হৃদয়ের অবস্থা জানতেন তাই তিনি অদৃশ্য হতে মরদেহ রাবওয়া পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। জামাতের ব্যবস্থাপনায় বড় ছেলে মরদেহ নিয়ে লাহোরে পৌঁছান। অতঃপর আমরা দু'ভাই আব্বার মরদেহ রাবওয়া নিয়ে পৌঁছালাম। জামাতের এ ব্যবস্থাপনায় যাঁর অবদান অনস্বীকার্য ও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তিনি হলেন জামাতের তৎকলীন আমীর এস. এম. হাসান, সি.এস.পি. সাহেব। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

অপর দিকে ঐশী হাত কাজ করছিল। আমাদের জানা ছিল না, রাবওয়াতে দাফন করার ব্যাপারে কী করতে হবে। এ-ও জানা ছিল না, বেহেশ্‌তি মাকবেরাতে সাহাবীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে দাফন করার ব্যাপারে কী নিয়ম আছে। মৃত্যুর খবর রাবওয়াতে পৌঁছার সাথে সাথে ওসীয়্যত বিভাগ দাফন করার ব্যপারে ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মরহুম

পিতার ওসীয়্যতের ফাইল খুলে যা দেখলাম তা'তে হৃদয় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। ঐশী সাহায্য কীভাবে তাঁর শেষ সফরের বিষয়াদিকে সহজ ও সুন্দর করে দিল। সদর আঞ্জুমানের সদর হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব ফোন মারফত জানাযার খরব বেহেশ্‌তি মাকবেরার অফিসে জানান। তাঁরা তাদের কর্মপ্রণালী অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। অন্যদিকে চৌধুরী মুজাফ্‌ফর উদ্দীন বাঙ্গালী সাহেব ওসীয়্যত বিভাগকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানান, "যদিও মাওলানা জিল্লুর রাহমান সাহাবী নয় তথাপি আহমদীয়তের খেদমতে ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান রয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সাহাবীগণের জন্যে নির্ধারিত স্থানে দাফন করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে (ওসীয়্যত ফাইল ৩৬ পৃঃ)। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ওসীয়্যত বিভাগ মোকাররম ও মোহতরম মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেব, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদকে লিখেন যে, মাওলানা সাহাবী তো ছিলেন না কিন্তু তাঁর খেদমত সম্পর্কে নেযারাতে ইসলাহ ও ইরশাদ ভালো জানে। হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব, সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে লিখেন, সাহাবীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে দাফন করার ব্যাপারে হুযূর (আঃ)-এর হেদায়াতের ওপর আমল করা হোক"। মোকাররম ও মোহাতরম জালালাউদ্দীন শামস্ সাহেব সে দিনই হুযূর (আঃ)-এর নিকট রিপোর্ট লিখে পাঠান যে, তাঁর খেদমতের জন্যে যদি তাঁকে সংরক্ষিত স্থানে দাফন করার অনুমিত দেন তবে তা মেহেরবানি হবে।" তিনি এ-ও লেখেন, এর পূর্বে মোকার্‌রম মালেক আব্দুর রহমান সাহেব খাদেম, মরহুমের ভাই সূফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী এবং হেকিম ফজলুর রহমান সাহেবকে সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সিলসিলার খেদমতের কারণে বিশেষ সংরক্ষিত স্থানে দাফন করা হয়েছে।"এই নোটের উপর প্রাইভেট সেক্রেটারী জনাব আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব লিখেন, "হুযূর বলেছেন, অনুমতি দেয়া হলো" স্বাক্ষর -আব্দুর রহমান আনওয়ার।

এভাবে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা হয়ে যায় যে, যেখানে মরদেহ রাবওয়া পৌছারই আশাই ছিল না সেখানে আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযলে তিনি বেহেশ্‌তি মাকবেরায় সাহাবীদের জন্যে সংরক্ষিত স্থানে সমাহিত হন। তাঁর কবর কিতা (খন্ড) নম্বর ১০, অংশ ১৫ নম্বর, কবর নম্বর ৪ মধ্যবর্তী চার দেয়ালের পশ্চিমে অবস্থিত। মনে হয় যেন রাবওয়া বেহেশ্‌তি মাকবেরায় মাটি তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

এ খানেই উল্লেখিত ঋষি কল্প-পুরুষের জীবন নাটকের যবনিকাপাত হয়। মৃত্যু আত্মার মুক্তি ও সদ্‌গতি লাভরূপ পথের দ্বার মাত্র। এ দ্বার অতিক্রম ব্যতিরেকে কোন মানুষই স্বীয় অভিষ্ট স্থানে উপনীত হতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু সংসারের চিরাচরিত বিধি-নিয়ন্ত্রিত বিধান: তবে যাঁরা পার্থিব জীবনে ধর্ম ও কর্ম উভয় দিক রক্ষা করে কয়টা দিন কটিয়ে যেতে পারেন জগতে তাঁরাই ধন্য। আর যাঁরা মৃত্যুর পরেও সংসারে স্মরণীয় হয়ে থাকেন জগতে একমাত্র তাঁরাই অমর।

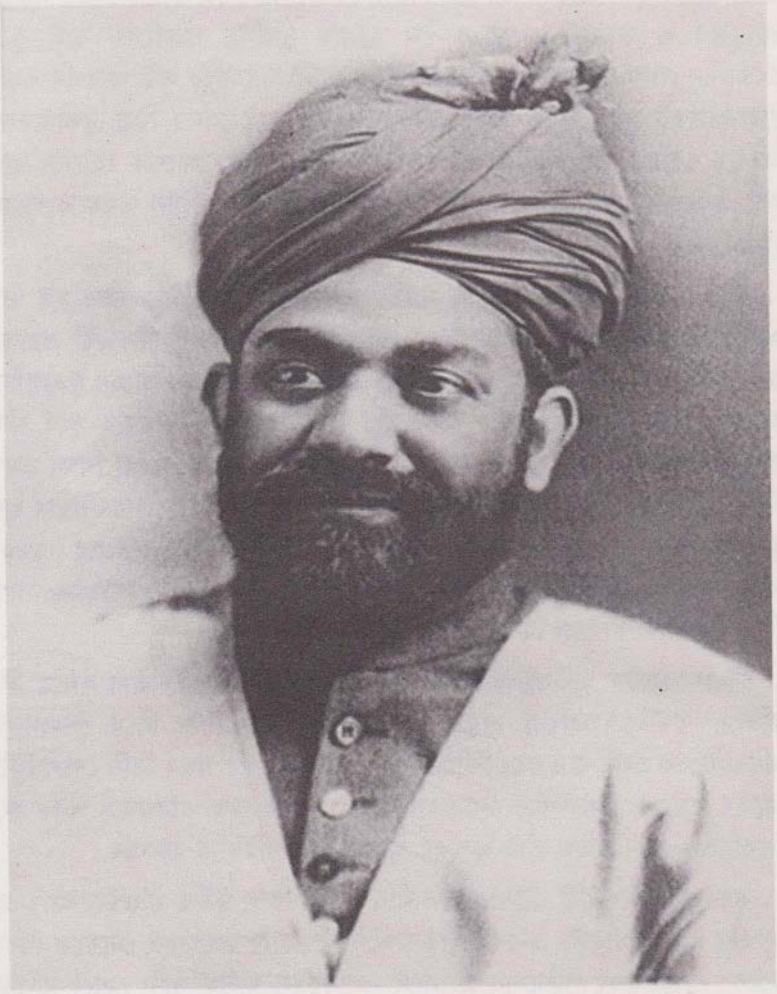

সুফি মতিউর রহমান

সুফী মতিউর রহমান

সুফী মতিউর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা হাইস্কুল থেকে সৈয়্যদ মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি বগুড়ায় কলেজ শিক্ষা জীবন শুরু করেন। কলেজের প্রাথমিক দিনগুলোতে তাঁর চরিত্রের সততা, ধর্মানুরাগ ও আন্তরিকতা তৎকালীন চট্রগ্রাম মুসলিম গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রাবস্থাতেই তার নিকট তিনি তাঁর বোনকে বিবাহ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মতিউর রহমান সাহেবের সে স্ত্রী পরলোক গমন করে। আশেক হোসেন নামে তার এক পুত্র সন্তানও ছিল। সে শৈশবেই মারা যায়। তিনি তখন কলেজের ছাত্র।

১৯১৭ সালে জিল্লুর রাহমান সাহেব ও মতিউর রহমান সাহেব দুই ভাই কাদিয়ানে হিজরত করেন। মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব জীন্দেগী ওয়াক্‌ফ করে মোবাল্লেগ ক্লাসে ভর্তি হন। অপর দিকে মতিউর রহমান সাহেব ইসলামীয়া কলেজ, লাহোরে বি.এ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কাদিয়ান যাওয়ার পুর্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইএ পাস করেছিলেন। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাঁকে সিয়ালকোট জেলার ঘাটিয়ালিয়াঁতে জামাতে আহমদীয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৭ সালে পাঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯২৮ সালে তাঁকে মিশনারী ইনচার্জ হিসাবে আমেরিকায় পাঠানো হয়।

সিয়ালকোটের ঘাটিয়ালিয়াঁতে স্বল্পকালীন প্রধান শিক্ষক থাকার সময়ে নিজ প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা,সরলতা সাধুতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। বিশ বৎসর পর যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন ঘাটিয়ালিয়াঁর লোকজন তাঁকে দেখার জন্য রাবওয়াহ্ পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল। এমনই ছিল তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার আকর্ষণ।

কাদিয়ানে মিশনারী ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে তিনি মসীহ মাওউদ(আ:)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী জনাব ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের মেয়েকে বিবাহ করেন। আমেরিকা পাঠানোর প্রাক্কালে খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) মতিউর রহমান সাহেবকে 'সুফী' উপাধী দেন এবং নিজের নামের সাথে 'বাঙ্গালী' শব্দটি যোগ করার জন্য উপদেশ দেন। তারপর থেকে তিনি 'সুফী' মতিউর রহমান বাঙ্গালী হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। আমেরিকাতে তিনি নিজেকে Sufi M.R. Bengalee হিসাবে পরিচিত করতেন।

আমেরিক যাওয়ার প্রাক্কালে সুফি মতিউর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী, এক মেয়ে এবং দুই ছেলে রেখে ইন্তেকাল করেন। সদ্য মাতৃহারা ছেলে-মেয়েদের কাদিয়ানে রেখে বিদেশে যাওয়া তার পক্ষে বেশ বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু ইসলাম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে খলিফাতুল মসিহ সানী নির্দেশে তিনি আমেরিকা গমন করেন। সুফি মতিউর রহমান সাহেবকে খলিফাতুল মসিহ তার পক্ষ হতে সরাসরি বয়াত গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৪]

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সুফি মতিউর রহমান সাহেব সল্পকালীন ছুটিতে কাদিয়ান আসেন। এসময়ে তিনি বোর্নিওর মুসলিম মিশনারী ডাক্তার বদরুদ্দিন আহমেদ সাহেবের কন্যাকে বিয়ে করেন। এই ঘরে তার দুমেয়ে এবং এক ছেলে জন্ম গ্রহণ করে।

মাওলানা বশির আহমদ সিন্ধী, যিনি পশ্চিম আফ্রিকায় দীর্ঘকাল জামাতের মোবাল্লেগ ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, "আমি আফ্রিকায় কর্মরত থাকাকালীন একদিন একটি বাচ্চাকে তার নাম জিজ্ঞেস করি। উত্তরে সে বলল, তার নাম বাঙ্গালী। আমি বাঙ্গালী শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারল না। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হলাম, কীভাবে তার নাম বাঙ্গালী রাখা হলো। আসল ব্যাপারটা পরে ছেলেটার বাবার কাছে জেনেছি। সে সময়ে আমেরিকা থেকে সুফী মতিউর রহমান বাঙ্গালীর প্রচুর লেখা আফ্রিকাতে যেতো। তাঁর লেখা পড়ে সেখানকার আহমদীরা এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিলো, যে, "বাঙ্গালী" শব্দটি নাম মনে করে নিজের ছেলের নাম রেখেছে বাঙ্গালী।

আমেরিকাতে থাকাকালীন সময়ে তিনি হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন ধর্মীয় সভা-সমিতিতে প্রচুর বক্তৃতা দিয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখা -নিবন্ধ ছেপেছেন। তিনি "মুসলিম সানরাইজ" নামে পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সে সময়ে মুসলিম সানরাইজ পত্রিকাটিই আমেরিকাতে মুসলমানদের একমাত্র ইংরেজী পত্রিকা ছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। তিনি Life of Muhammad এবং The Tomb of Jesus নামক দু'টি পুস্তক রচনা করেন।

The Chicago Herald Examiner, The Chicago Daily Tribune, The Chicago Daily News, The Kansas City Call, The Minot Daily News, The Syoax City Tribune, Stainley Sun. ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হতো।

তিনি একজন অনর্গল বক্তা, একজন প্রসিদ্ধ লেখক এবং সফল মোবাল্লেগ হিসাবে স্বীকৃতি পান। মতিউর রহমান সাহেব একজন প্রভাব-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯৩৫ সালে যখন তিনি কাদিয়ানে ফিরে যান তখন আমেরিকার একটি আরবী পত্রিকা "আল্-বয়ান"এর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়,

"সুফী সাহেব ১৯২৮ সনে আমেরিকাতে এসেছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের বিরাট খেদমত করেছেন। অকৃত্রিম অধ্যবসায়, দৃঢ় মনোবল, জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে সর্ব স্তরের লোকদের কাছে প্রিয় করে তুলে। তিনি একজন প্রতিভা সমৃদ্ধ বক্তা ও ধর্ম প্রাণ সাধু ব্যক্তি ছিলেন "।২৫

১৯৩৫ সালে আমেরিকা থেকে কাদিয়ান ফেরার পথে যাত্রা বিরতির সময়ে বোম্বাই জামাতে তিনি দারুণভাবে সম্বর্ধিত হন। সম্বর্ধনায় জামাতের বন্ধুরা বলেন, "আমরা মহামান্য স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (যিনি বর্তমানে ভারত সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন আছেন)-এর নিকট শুনেছি, তিনি আমেরিকা ভ্রমণের সময় আপনার আত্মনিবেদিত গৌরবোজ্বল কাজের সফলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যে মহিমান্বিত ভাষায় আপনার কর্মকান্ড ও তাঁর সফলতার কথা বর্ণনা করে যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে আমাদের প্রাণ আনন্দ খুশিতে ভরে যায়। তাঁর চেয়ে অধিক কিছু বলার আমাদের ভাষা নেই"।

১৯৩৬ সালে তিনি একবার নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে আসেন। এ সময়ে তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বগুড়ার এডওয়ার্ড হল এবং টকি হাউসে দু'টি বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা সুধীসমাবেশে বেশ সমাদৃত হয়। পড়ে তিনি নাটোর, রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইত্যাদি জামাত পরিদর্শন করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। সুফী মতিউর রহমান সাহেব সে অভিনন্দনের এক হৃদয়গ্রাহী উত্তর দেন। অভিনন্দনের উত্তরে বাংলা ভাষা, মাতৃভূমি, দেশের মানুষ এবং আহমদীয়তের প্রতি তাঁর এক মমস্পর্শী দরদ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকাতে থেকেও দেশের মানুষের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি। নিজ হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করতে যেয়ে তিনি বলেন ঃ

"আপনারা আমাকে সুদূর বিদেশে থাকিবার কালে স্নেহময়ী বঙ্গভূমিকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দ:) বলিয়াছেন, "দেশকে ভালবাসা ঈমানের অংশ। জননী জন্মভূমি স্বর্গদপী গরিয়সী"। এই সুর্দীঘ প্রবাস কালের মধ্যে আমার উপর এমন এক মুহূর্তও আসে নাই যখন আমি সুধাময়ী বঙ্গভূমি এবং তাহার সুযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ সন্তানগণকে ভুলিতে পারিয়াছি। আপনারা গতকাল যেমন ভাবে সদা সর্বদা আমার হৃদয়ের উচ্চস্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন,

আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, ভবিষ্যতেও আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা সেইরূপভাবে আমার হৃদয় সিংহাসনে আসীন থাকিবেন। প্রেমময়ী বঙ্গভূমি এবং তাহার পরম উদ্যোগী সন্তানদের এই গভীর ও পবিত্র দয়া, করুণা স্নেহ মততা আজীবন ভুলিব না।

কেবল তাই নয়, আমি আরো একপদ অগ্রসর হইতে চাই। বঙ্গদেশের ভালবাসা এবং সেবাই আমাকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরতরে প্রবাসী হইতে বাধ্য করিয়াছে। আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ এবং আপনাদের দোয়ার ফলে আমাদ্বারা যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্রও কৃতকার্যতা লাভ হয় তাহা আমার কৃতকার্য্যতা নয়, ইহা বঙ্গ এবং বঙ্গবাসীদের কৃতকার্য্যতা; কারণ আমি বঙ্গদেশেরই এক নগণ্য সন্তান ও দাস"।[২৬]

১৯৩৭ সালে পুনরায় তিনি কর্মক্ষেত্রে আমেরিকা ফিরে যান এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত সেখানে কর্তব্যরত ছিলেন। ডাইবেটিস-এ আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দেশে ফিরে আসেন। শেষের দিকে গ্যাংরিনে আক্রান্ত হলে তার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। দেশে ফেরার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি Review of Religions পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৫৫ সালের ৩০শে অক্টোবর বেলা সাড়ে তিনটায় এই কর্মবীর স্বীয় কর্তব্য সমাধা করে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। পরের দিন ৩১শে অক্টোবর হযরত খলীফাতুল সানী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাকে বেহেশতি মাকবেরায় কিতায়ে খাসে (সংরক্ষিত অংশে) সমাহিত করা হয়।

আল্লামা জিল্লুর রাহমান রচিত

তিনটি প্রবন্ধ সংকলন

১। ইসলামের কষ্টি

২। ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। জন্মান্তর বাদ

ইসলামের কষ্টি

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আরবের মরুভূমিতে এক মহা পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি দুর্ধর্ষ অসভ্য অরাজক আরবদের মধ্যে যে অভাবনীয় মহা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এই অর্দ্ধ উলঙ্গ অসভ্য আরবদের মধ্যে যে মহা প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারই ফলে এক দিন তাহারা জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি ধর্ম নৈতিক, কি সমাজ নৈতিক সব দিক দিয়াই তাহারা বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের শিল্প বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চ্চা ইত্যাদির প্রচুর দান এখনও দুনিয়ার জ্ঞানভান্ডারে বর্তমান রহিয়াছে, দুনিয়ার কোণায় কোণায় এখনও তাহাদের কীর্ত্তি অতীতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

প্রগতিশীল দুনিয়া যদিও জড়-বাদিতা ও জড়-বিজ্ঞানের দিক দিয়া আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু মানবতার তথা বিশ্ব-মানবতার পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করিতে, অর্থাৎ মানুষকে প্রকৃত মানুষ নামের অধিকারী করিতে এখনও জগৎ সেই শিক্ষার সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী। সেই মহাপুরুষের নাম হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার শিক্ষাই ইসলাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

(ইসলাম, কথাটার অর্থ হচ্ছে 'শান্তি' তিনি তাঁর শিক্ষার এই নাম দিয়ে, ঘোষণা করছেন যে, এই শিক্ষার দ্বারাই জগতে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। মানব জগতকে পূর্ণ শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে পরিণত করাই তাহার আবির্ভাব ও তাঁহার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।)

কি করে তাঁর শিক্ষার ভিতর দিয়া মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারে আমি আজকার বক্তৃতায় এ সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করব। জগতের কল্যাণ কর্তা পরম দয়াময় আল্লাহই এ বিষয়ে আমার সহায় হউন- আমি এই প্রার্থনা করি। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) শিক্ষার প্রথম বিষয়ই হচ্ছে-

১। এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, পূর্ণ, ইচ্ছাময় সত্তা আছেন, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম' তিনি সকল মানুষের পরম পিতা, তাঁর কোন 'অনলি বিগটেড' নাম নাই বরং

২। সকল মানুষই তাঁর সন্তান। অতএব মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ভাই ভাই। মানুষকে সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় পিতা ছাড়া আর কারও পুজা করতে নাই। لا اله الا الله

এই শিক্ষার প্রভাবেই দুর্ধর্ষ আরবজাতি যাহারা মানুষের রক্তে হোলি খেলিয়া পৈশাচিক অট্টহাসির মধ্যে আনন্দ অনুভব কচ্ছিল তাহারা এইরূপ ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল যে তাহার তুলনা পৃথিবীতে সহোদরদের মধ্যেও অতি বিরল পরিলক্ষিত হইবে।

এই শিক্ষার প্রভাবেই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মানুষের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই, উঁচু নীচ নাই, সকল মানুষই পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার রাখে, মানুষ মানুষের গোলামি করতে পারে না- মানুষকে মানুষের গোলামির জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। এই শিক্ষার প্রভাবেই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটগণ নিজেদের দুহিতাকে তথা কথিত ক্রীত দাসদের হস্তে সমর্পণ করিতে সংকোচ বোধ করেন নাই। দাসী পুত্রের হস্তে রাজসিংহাসন সমর্পণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইসলামী শিক্ষায় সম্মানের মাপকাঠী শুধু মানবতা- ان اكرمكم عند الله اتقى كم

তোমাদের মধ্যে মানবতার দিক দিয়া যে ব্যক্তি যতখানি বেশি সেই ততখানি বেশি সম্মানের উপযোগী। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের এই শিক্ষা যতটা সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সাম্য ও মৈত্রীর বলেই তাহারা ক্রমশঃ সমস্ত দুনিয়াকে ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

৩। ইসলামের আর একটা শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এই বিরাট বিশ্ব তাঁহার অংশ নয় বরং তাঁহার সৃজিত, তিনি অনাদি অনন্ত, অনাদিকাল হইতেই তিনি সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করিতে থাকিবেন, তাঁহার কোনও গুণ কখনও নষ্ট হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে সেই অনন্তকে লাভ করিবার সুপ্ত আকাঙক্ষা আছে। ইসলামী শিক্ষায় ইহা মানুষের সেই সুপ্ত ভগবৎ দর্শনের আকাঙক্ষাকে জাগ্রত করিয়া দেয়- শুধু তাই নয় বরং এই রকম সাধনার পথে পরিচালিত করে যাহাতে মানুষ, প্রত্যেক মানুষ, তাহার পরম পিতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসিতে পারে। জগতের স্রষ্টা জগত হতে সমপূর্ণ পৃথক হইলেও মানুষের লভ্য- মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। মানুষের জীবনের চরম ও পরম স্বার্থকতাই হইবে ভগবৎ দর্শন লাভ করা এবং ইহ জীবনে তাঁহাকে লাভ করিয়া মরণের পরপারে অনন্ত জীবন ব্যাপিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে থাকা। তাঁহাকে লাভ করার মানে, তাঁহার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলা নয়।

মানুষের স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের যে অনুভূতি রেখেছেন, মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবার যে আকাঙক্ষা রেখেছেন, স্থায়ীত্বের যে পিপাসা মানুষের মধ্যে নিহিত আছে- তাহাতে বেশ বুঝা যায়, মানুষ নষ্ট করে

দেবার জন্য, বিলোপ করে দেবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই- মানুষের নিকট প্রকৃতি যে এই কথাটা কল্পনা করতেও পারে না। মানুষ যে চিরকাল তার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চায়।

"মানুষের মরে যাওয়াটা যে মরে যাওয়া নয়, আরও ভাল করে বেঁচে উঠা।"

একটু চিন্তা করে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে মানবজীবনের এইরূপ বিষাদান্তক যবনিকা পাত, একেবারে 'নাই' হইয়া যাওয়া যে মানুষের পক্ষে অচিন্তনীয়, অসহনীয়।

মানুষের করুণাময় স্রষ্টা মানুষকে এই বড় আশা নিরাশ করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই।

৪। তাই ইসলামের আর এক শিক্ষা হচ্ছে মানবের ইহ জীবনের পর পারে আরও অনন্ত জীবন আছে- উহাই মানুষের আসল জীবন। মানুষের এই জীবনের পূর্ব্ববর্তী মাতৃগর্ভে থাকাকালীন জীবন যেমন পরবর্তী বৃহত্তর জগতের উপযোগী দেহ গঠন করবার একটা স্তর মাত্র। এই রকম মানুষের ইহ জীবনটাও পরবর্তী বৃহত্তম অনন্ত জগতের উপযোগী অবিনশ্বর দেহ গঠন করবার একটা স্তর মাত্র।

এই শিক্ষার প্রভাবেই প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ ইহ জীবনকে তুচ্ছ মনে করিয়াছিল। ভগবৎ দর্শনের স্বাদ লাভ করিয়া পরবর্তী অবিনশ্বর জীবনের সম্বন্ধ পাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগকে মৃত্যু ভয় কখনও কর্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই তাহারা জীবন সংগ্রামে পদে পদে জয়লাভ করিয়াছে- যতদিন তাহাদের মনে এই শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান ছিল ততদিন পর্যন্তই তাহারা জীবনের স্বার্থকতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল।

৫। ইসলামের আর একটা শিক্ষা হচ্ছে এই যে, মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী, ক্রমশঃ মানুষ অনন্ত বৃহত্তর অবিনশ্বর জগতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, পিছনের দিকে ফিরে আসছে না। মানুষের জড় দেহকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন কতকগুলি নিয়ম ও কানুন পালন করিয়া চলা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য, মানুষের অনন্ত জীবনের উপযোগী অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক দেহকে রক্ষা ও অনন্ত পথে চলবার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য কতকগুলি আধ্যাত্মিক নিয়ম-কানুন পালন করাও নিতান্ত ভাবেই অপরিহার্য। এই নিয়ম-কানুনগুলি পালনে ব্যতিক্রম হইলে মানুষ অনন্ত পথে চলায় বাধা প্রাপ্ত হয়। সেই আধ্যাত্মিক নিয়ম কানুনের ব্যতিক্রমই শাস্ত্রে পাপ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পাপের বিষময় ক্রিয়াই নরক নামে অভিহীত হইয়াছে। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্য করিলে ইহ জীবনেই মানুষ মুক্তি লাভ করিয়া যাইতে পারে। অন্যথায় মরণের পর পারে

পাপের মাত্রা অনুযায়ী কিছুকাল পাপের বিষময় ফল ভোগ করিয়া অবশেষে সমস্ত মানুষই মুক্তি লাভ করিবে।

৬। ইসলামের আর একটা শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানব-স্বভাবের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, মানুষ এই প্রবৃত্তিগুলির যথাবিহীত অনুশীলন ও ব্যবহার দ্বারাই বিশ্বস্রষ্টা খোদাতাআলার সঙ্গে যোগ সাধন করিতে পারে, খোদাতাআলাকে লাভ করিতে পারে। ঐ সমস্ত প্রবৃত্তির অপব্যবহারেই মানুষ খোদা হইতে দূরে সরিয়া যায়, ভগবৎ দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলির অপব্যবহার যেমন অন্যায়, ইহাদের ব্যবহার না করাও তেমনি দোষণীয়। মানুষের স্রষ্টা মানুষকে ঐ সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলি এই জন্য দান করেন নাই যে, মানুষ তাহা নষ্ট ও ব্যর্থ করিয়া দেবে।

ঐশী ইচ্ছার অধীনে ঐ সমস্ত শক্তির বিহীত পরিচালনার ভিতর দিয়াই মানুষ ভগবান লাভ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর নয়। কি করে মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তিগুলির ভিতর দিয়াই ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসিতে পারে বিস্তৃতভাবে সময়ান্তরে ইহার আলোচনা করার বাসনা রহিল।

৭। মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিনিচয়কে কি করে দৈব ইচ্ছার অধীনে পরিচালিত করিয়া জগৎ পিতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসা যায়, কি করে এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে পাশবিকতার কবল হইতে মুক্ত করিয়া আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে আনা যায় সেই রহস্য উৎঘাটন করিবার জন্যই যুগে যুগে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নবী রসুল বা অবতারগণের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হইতেই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতিতে এই রকম বহু মহা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশ কাল পাত্র ভেদে মানব জাতির বিভিন্ন অংশকে তাঁহারা বিশ্ব-মানবতার ও আধ্যাত্মিকতার চরমের দিকে ক্রমে এগিয়ে এনেছেন।

ঐ সমস্ত মহাপুরুষগণের প্রদত্ত শিক্ষার মৌলিক সত্যতা স্বীকার করা ইসলামের আর একটা প্রধান শিক্ষা। জগতের যাবতীয় ধর্ম প্রবর্তকগণের সত্যতা স্বীকার না করিয়া কেহই প্রকৃত অর্থে মুসলিম নামের অধিকারী হইতে পারে না। এই শিক্ষার প্রভাবেও মুসলমানগণ দুনিয়ার যাবতীয় জাতিসমূহের মধ্যে স্বাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

৮। ইসলামের শিক্ষার আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, হজরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) ধর্ম অতীত জগতের যাবতীয় মৌলিক নিত্য সত্য সমূহ ও ভবিষ্যৎ

জগতের জন্য চিরকল্যাণকর আইন কানুনের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে। ইসলামের উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মানবমন্ডলী দ্বারা এক বিশ্ব-মানবজাতি গঠন করা। তাই ইসলাম বলিতে প্রকৃত অর্থে জগতের যাবতীয় অতীত ধর্মসমূহের সমন্বয় বা যোগ বুঝায়।

ধর্ম প্রবর্ত্তকগণের অন্তর্ধানের পর প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই মানব মস্তিষ্ক প্রসূত যে সমস্ত কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া থাকে ঐ সমস্ত কুসংস্কার বা সাময়িক দেশাচার বাদ দিয়া যাবতীয় ধর্মের মূলনীতি ও ভবিষ্যৎ মানব জগতের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শান্তির রাজ্য স্থাপন করার উপযোগী নিয়ম কানুন নিয়াই ইসলাম ধর্ম গঠিত হইয়াছে, এবং শান্তি ধর্ম স্থাপন করাই হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফার (সাঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

৯। তাই ইসলামের আর একটা শিক্ষা হচ্ছে, যে সমস্ত কারণে মানব জাতির মধ্যে ভেদাভেদ বৈষম্য ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় তাহার সমুলে উৎপাটন করা। এই জন্য হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) শিক্ষায় এমন কতকগুলি ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাতে শোষণ নীতি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, যেমন সুদ, ব্যবসা এক চেটিয়া করা- যাহাতে অর্থের বিভাগে স্বাভাবিক ক্ষমতা রক্ষা হয়। এই জন্য প্রত্যেক মৃতব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বহু ওয়ারিশানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া; প্রত্যেক ব্যক্তির ইনকামের মধ্যে সমাজের ন্যায্য অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া, সঞ্চিত ধনের মধ্য হইতে সমাজের? নির্ধারিত করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি ব্যবস্থ যদি আজ জগতে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে দুনিয়ার অর্থ বিভাগে এই ভয়াবহ ও শোচনীয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না। রিক্ত জন সাধারণের হাহাকার আজ দুনিয়ায় আকাশ ও পাতাল নিঃস্ব মুখরিত করিয়া তুলিত না।

১০। ইসলামিক রাজনীতি। সমগ্র বিশ্বের মানবমন্ডলীর মধ্যে একই পরম পিতার সন্তান এই অনুভূতি জাগ্রত করিয়া ভ্রাতৃ ভাবের সৃষ্টি করা সমাজিক উচ-নীচতা দূর করিয়া দিয়া মৈত্রী ও সাম্যের সৃষ্টি করা এবং সমগ্র মানবজাতির ধর্মানুমদিত সুনির্বাচিত ধর্ম নেতার অধিনায়কতায় মানব জগতে শাসন কার্য পরিচালন করা এবং মানব জাতির মাতৃভূমিকে খণ্ড খণ্ড এবং টুকরা টুকরা না করিয়া বৃহত্তর ও প্রসারিত করার পরিকল্পনা দিয়া হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া শান্তিময় স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার ব্যবস্থা দিয়া গেছেন।

বস্তুতঃ এই ব্যবস্থা যতদিন মানব জগতে গৃহীত না হইবে, এই ব্যবস্থা যতদিন মানব জগতে প্রবাহিত ও পরিচালিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত জগতে প্রবাহিত ও পরিচালিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত জগতের শান্তি সুদূরপরাহত।

আমার বিশ্বাস এই পরিকল্পনা হজরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) অলীক স্বপ্ন নয়, বরং জগৎ পিতার মঙ্গলময় ইচ্ছারই অভিব্যক্তি মাত্র। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) শুধু তারই মঙ্গলময় ইচ্ছায়, তাঁরই পবিত্র বাণীর মধ্য দিয়া- এই পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন।

দেড় হাজার বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জগৎ যে সমস্ত আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে যে ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পূর্বাভাষ মাত্র।

আমার মনে হয় মানুষ মানুষের রক্তের স্রোতে সাঁতার কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত বিশ্ব মানবতার সমতল সৈকত ভূমির দিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। সেই দিন যেন আর বেশী দূরে নাই, যে দিন মানুষ মানুষকে ভাই বলে ভাবতে শিখবে- মানুষ মানুষকে প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে, এবং মিলিত কণ্ঠে বিশ্ব-পিতার জয় গান করবে। لا اله الا الله - محمد رسول الله

(২০শে এপ্রিল ১৯৪০ সালে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার হলে আহমদীয়া মিশনারী মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা।)

ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

ধর্ম্মের অর্থ

যে সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া মানবের ইহজীবন ও মৃত্যুর পরপারের অনন্ত জীবন কল্যাণময় হয়- যে সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া মানুষ বিশ্ব-স্রষ্টাকে লাভ করিতে পারি- যে শিক্ষা বিশ্ব-স্রষ্টা মানবের ইহকাল ও পরকালকে কল্যাণমণ্ডিত করিবার জন্য ঐশী প্রেরিত মহাপুরুষগণের মারফত দান করিয়াছে-যে নিত্য সত্যসমূহ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে-ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ লোকে ইহাই বুঝিয়া থাকে।

'ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ' অর্থে বিশ্ব-স্রষ্টার বা নিত্য সত্যের একাধিপত্য বুঝায়। যাহা নিত্য সত্য সকল মানুষই যদি তাহা মানিয়া লয় তাহা হইলেই ধর্ম্মের একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

কাহারো আধিপত্য স্বীকার না করার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

অন্যায়ের আধিপত্য স্বীকার করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম গোলামী।

অন্যায়ের গোলামী করিব না বলিয়া ন্যায়ের সম্মুখেও মস্তক অবনত করিব না- ইহা মূর্খতা।

আজকাল জগতে কতকগুলি ধর্ম্ম আছে; সেই ধর্ম্মগুলিতে যাহারা বিশ্বাসবান তাহারা চায়, সকল মানুষই তাহাদের সেই ধর্ম্ম মানিয়া লউক। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, তাহা মানিয়া লওয়াই আল্লাহ্‌কে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এবং তাহা মানিয়া লইয়া সকলে এক মতাবলম্বী হইতে পারিলে মানব-জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

বিভিন্ন ধর্ম্মের কোনটা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, এ বিষয় এখন আমার আলোচ্য নয়; কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মে আস্থাবান ব্যক্তিদের এই মনোবৃত্তি যে,-'আমার ধর্ম্মই সকল মানুষই গ্রহণ করুক'- কি খুব নিন্দনীয়?

শুধু ধর্ম্মের কথা কেন, আমি বলিতে চাই, যে কোন মত কেহ পোষণ করে, আর সেই মতটাকে যদি সে মানবের কল্যাণকর বলিয়া মনে করে এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে- তাহা হইলে মানবতার দিক দিয়া কি একটা মস্তবড় কর্ত্তব্য হইবে না যে, জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে তার সেই মতটা সে প্রচার করে? তাহার মানব-হৃদয়ের প্রবল আকাঙক্ষা কি এই হইবে না যে, সকল মানুষই এই সত্যটা স্বীকার করিয়া লউক?

গালিলিও যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে তখন তিনি প্রাণের বিনিময়েও জগতকে এই সত্য দিয়া যাইতে, মানুষকে এই সত্যের মধ্যে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া কি খুব অন্যায় করিয়াছিলেন? 'পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে, না সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে' এই তর্কের সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারলে মানব জগতের যে পরিমাণ ক্ষতি হইত, তাহার তুলনায় মানুষের অনন্ত জীবনকে কল্যাণময় করিবার উপযোগী কোন সত্য তথ্য যদি কেহ লাভ করে, আর যদি সে মনে করে যে ইহার জ্ঞানের অভাবে মানুষের অনন্ত জীবন মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে ইহার প্রচার না হওয়ার ক্ষতিটা যে অতি বড় তাহা পরকাল ও মৃত্যুর পর অনন্ত-জীবনে বিশ্বাসী কোন মানব অস্বীকার করিতে পারে না।

সুতরাং এই অনন্ত জীবনকে কল্যাণময় করিতে কোন সত্য তথ্য যদি কেহ লাভ করেন তাহা জগতকে দান করিবার জন্য তাঁহার মানব-হৃদয় কত ব্যাকুল হইয়া উঠিবে গ্যালিলিও প্রমুখ মনীষীগণের দৃষ্টান্তে আমরা ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি এবং কোন বুদ্ধিমান ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, মানুষ মানুষকে হিতের দিকে আহ্বান করিবেই।

কোন্‌টা হিত, কোন্‌টা অহিত, তাহা নিয়া মতভেদ থাকিতে পারে। আমি যাহাকে হিত মনে করি আর একজন তাহাকে অহিত মনে করিতে পারে। আমি যাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, আর একজন তাহাকে অসত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে; কিন্তু মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক সহানুভূতি একে অন্যকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করিবেই।

এই টানাটানির ফলে যে বুঝা পড়া হইবে তাহাতেই মানব জগতের সমস্ত ঝগড়ার অবসান হইবে। মানুষ বিভিন্ন পথ ছাড়িয়া একই পথে, একই উদ্দেশ্যে গলাগলি করিয়া চলিবে। সেই দিন কি পৃথিবীতে আসিবে না?

উল্লো দিকটা

'যত মত তথ পথ'-'সকলকেই যার যার মতে থাকিতে দাও, 'সকলই আমারটা মানিয়া লও' বলিয়া টানাটানি কেন কর, ইহাতে যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, অশান্তি আসে'- শান্তিকামীর এই মিঠা বুল ছাই দিয়া আগুন ঢাকার মতও নয়, বরং শুকনা খড় দিয়া আগুন ঢাকার মত অশান্তির আগুনকে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস বই আর কিছুই নহে।

এই মতটাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই মতটা প্রচার করিবারও কোন মিষ্টভাষী শান্তিকামীর অধিকার থাকে না। পক্ষান্তরে 'যত মত তত পথ' যদি সত্য হয়, তাহা হ'লে স্বীকার করিতে হইবে যে, "একটা পথ বই দুইটা সত্য হইতে পারে না"- এই মতটাও সত্য; কারণ এইটাও যে একটা মত। এই মতটা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে, "যত মত তত পথ" সত্য হইতে পারে না। ইহা একটা মোটা কথা। 'সকলকেই যার যার পথে থাকতে দাও'- এই মত যাহারা সমর্থন করেন তাহাদের পক্ষে- একমাত্র সত্য পথের দিকে টানিয়া আনিয়া এক পথের পথিক কর"-এই মতাবলম্বীদের ধর্ম্ম-বিশেষের একাধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুখ খুলিবার বা কলম ধরিবার কোন যুক্তি থাকে না। কোন মতেরই যদি একাধিপত্য জগতে না হইতে পারে, তবে 'না হইতে পারা' মতটাও প্রচার করিবার কাহারো অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব যিনি মনে করেন, পৃথিবীর সবগুলি ধর্ম্মমতই সত্য, তার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

আসল কথা

'যত মত তত পথ' সত্য নয়। এই পৃথিবীতে যতগুলি মত আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এত বিরোধ যে, একটা সত্য হইলে আর একটা সত্য হইতে পারে না। রুই মাছ যদি কাহারো মতে ভগবান হওয়ার দরুণ মানুষের অখাদ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর একজনের মতে ইহা খাদ্য হইতে পারে না; কারণ ভগবান বা দেবীকে খাওয়া কিছুতেই সমর্থিত ও সহনীয় হইতে পারে না। আর যদি ইহা মানুষের খাদ্য হইয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ভগবান বা দেবতা নহে।

ইহা একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত মাত্র। আমার মনে হয় বাস্তব জগতে এই রকম এই এবং প্রকৃতির মত-বৈষম্য মানব-জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মে ভুরি ভুরি বিদ্যমান আছে।

অতএব, 'যত মত তত পথ' সত্য নয়। জগতের মধ্যে বহু অসত্য, সর্ব্বনাশকারী, মানব-জগতের জন্য অভিশাপস্বরূপ মত আছে; এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে বহু মত এমনও আছে যাহা চির সত্য, সনাতন।

সুতরাং

যাবতীয় অসত্য মতগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যেখানে যাহা সত্য আছে সবগুলি সত্যের সমষ্টি নিয়া যে ধর্ম্ম গঠিত হইবে বা হইয়াছে-দুনিয়ার সমস্ত মানবকে সেই ধর্ম্মে একত্র করিতে হইবে। সেই ধর্ম্মই হইবে মানব-জাতির মহামিলন ক্ষেত্র।

তালাস করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, এমন কোন ধর্ম্ম জগতে আছে কি না, যাহা যাবতীয় সত্যের সমষ্টি নিয়া গঠিত। তাহা হইলেই আল্লাহ্‌র দেওয়া বিচার শক্তির সদ্ব্যবহার করা হইবে। আর 'যত মত তত পথ'কে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াটা অলস শান্তির প্রয়াসে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিবেক বুদ্ধির অপব্যবহার বই আর কিছুই নহে।

ব্যক্তি বা সমষ্টি বিশেষ যখন সমস্ত জগৎ জুড়িয়া নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায়, গোটা জগতটাকে নিজের করতলগত করিতে চেষ্টা করে, তাহার ফলে যে একাধিপত্যের পত্তন হয়- এইরূপ একাধিপত্য বা সাম্রাজ্যবাদ, বা ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদকে অস্বীকার করা যে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকার হইতে প্রসূত তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

আর এক দিক

সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্ব যদি আমরা স্বীকার করি যে, তিনি মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন-

পরিত্রানায় সাধনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার প্রকাশকে মানিয়া লওয়া জগতের প্রত্যেক নর-নারীর কর্ত্তব্য হইবে।

অধর্ম্মের যখন প্রভাব হয়, অধর্ম্মের ফলে অন্ধকার যখন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে-শয়তানের সাম্রাজ্য যখন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলে,- তখন অনাদি অনন্ত বিশ্বের যিনি সম্রাট তিন তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখনই আবার সত্য যুগের আবির্ভাব হয়- স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হয়,- ইসলাম বা শান্তির রাজ্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের রাজ্য-প্রেমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গীতার উপরোক্ত বাণীও আমার এই কথাই সমর্থন করে।

অতএব

ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রভুত্ব মানিব না, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও,-বিশ্ব-স্রষ্টার প্রভুত্ব মানিব না, আমি শুধু আমারটাই মানিব, অন্যের কথা মানিব না- ইহা মস্ত বড় ভুল, ইহা নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সত্য কাহারও একার নয়, তাহা সকলের নিজের জিনিষ, তাহা অন্যের বলাও, মস্ত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা।

"সত্য কথা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের হারান ধন, যেখানে পায় কুড়াইয়া লয়।"

মিথ্যা কথা বলিও না, চুরি করিও না, অন্যের প্রতি অন্যায় করিও না, জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তাকে ভালবাস, ভক্তি কর, মৃত্যুর পরপারে মানুষের অনন্ত সাধনার জীবন আছে, সেখানে ইহ-জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি কথা কি কোন এক জাতির জন্য সত্য, অন্য জাতির জন্য নয়? ইহা যে সকলেরই নিজের প্রাণের কথা!

অতএব যে সত্য সকলের আপনার নিজের কথা- একান্ত নিজস্ব জিনিস- সেই সমুদয় সত্যের একাধিপত্য হউক, সেই সত্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক,-সমস্ত মানব জগৎ জুড়িয়া ইহাই প্রকৃত মানুষের অন্তর্নিহিত কামনা।

(২৩শে মে ১৯৩৭ তারিখে বগুড়ার উত্তর বঙ্গ আহমদীয়া কনফারেন্সের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

জন্মান্তর বাদ

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? পুনরায় জড় জগতে জড় দেহ নিয়া জন্মগ্রহণ করে কিনা ? যদি জন্মগ্রহণ না করে, জড়-জগতে জড় দেহে, তাহা হইলে এই জড়-জগৎ বৈষম্যময় কেন?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়- এই প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম যে সিদ্ধান্ত পেশ করিতেছে তাহা উপস্থিত করিবার পূর্বে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, কারণ জানা না থাকিলেও উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বিনা যুক্তিতে কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারি না।

আমাদের বর্ত্তমান জন্মের বৈষম্য কেন হইয়াছে জানি না বলিয়াই পুর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকে ইহার কারণ বলিয়া স্থির করিতেও পারি না।

পূর্ব্ব জন্মই যে ইহার কারণ, অন্য কোন কারণ নাই, তাহা সপ্রমাণিত হওয়া দরকার। আমার বাড়ির সম্মুখ দিয়া একটি লোক যাইতেছে দেখিয়াই আমি বলিতে পারি না যে, সে চুরি করিতে যাইতেছে। সে কোথায় যাইতেছে এই সিদ্ধান্ত আমি করিতে পারি না।

বর্ত্তমান জগতের বৈষম্যের কারণ আমাদের পুর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকে স্বীকার না করিলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি ন্যায়পরায়ণ- তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষাপাতিত্বের ও বিনা দোষে দুঃখ দেওয়ার অভিযোগ আসে। পুর্ব্ব-জন্মকে মানিয়া লইলেও অপরাধের কথা না জানাইয়া শাস্তি দেওয়ার দোষ হইতে আমরা তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে পারি না। সৃষ্টিকর্ত্তাকে এক দোষ হইতে বাঁচাইতে যাইয়া এর চেয়ে গুরুতর দোষে দোষী সাবস্তা করিতে হয়।

নিম্নোলিখিত বিষয়গুলি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, বর্ত্তমান জগতের বৈষম্যের আর যে কারণই হউক না কেন, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল নিশ্চয়ই এই বৈষম্যের কারণ নয়। কারণ-

১। আদি ও সৃষ্টির প্রথম মানবও খাদকরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব খাদক ও খাদারূপ বৈষম্য সৃষ্টির প্রথমই বিদ্যমান ছিল।

২। সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টি-ক্রিয়াকে নর-নারীর মিলনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। অতএব নর-নারী রূপ বৈষম্য সৃষ্টি-কর্ত্তার অভিপ্রেত, আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম্মফলস্বরূপ হইতে পারে না।

৩। বৈচিত্রময় জগতের বহু বৈষম্য আবহাওয়ার প্রভাবে সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া পুর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মকে তদ্রূপ বৈষম্যের কারণরূপে স্বীকার করিতে পারি না।

৪। জগতের বহু জীব-জন্তু মানব জীবনকে সহজ সুখময় করিয়া দেয়। এগুলি না হইলে মানব-জীবন দুর্ব্বহ- প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। যথা- গরু ঘোড়া ইত্যাদি।

৫। বর্ত্তমান জন্মের বৈষম্যের কারণ পূর্ব্ব-জন্ম হইলে দ্রব্যগুণ বা ঔষধের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইত না, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ব্যর্থ হইত।

৬। বর্ত্তমান জগতের বৈষম্যের কারণ পূর্ব্ব জন্ম হইলে এই জন্ম নষ্ট করার শক্তি মানুষের থাকিত না।

৭। বর্ত্তমান জন্মের বৈষম্যের কারণ পূর্ব্ব জন্ম হইলে বর্ত্তমান জন্মের কোন কর্ম্ম ন্যায় অন্যায় বিচারাধীন আসিতে পারে না।

৮। বর্ত্তমান জন্মের বৈষম্যের কারণ পূর্ব্ব-জন্ম হইলে সাদি বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্ক সংস্থান করা রুচি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

৯। পূর্ব্ব জন্ম স্বীকৃত হইলে ধার্ম্মিকের জন্ম দুঃখময়, কষ্টময় হইত না।

১১। পুর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে ত্যাগের ও উৎসর্গের কোন মূল্য থাকে না।

১২। 'সায়েন্স অব ইউজেনিকস' প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির বিদ্যামানতার পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইতে পারে না।

১৩। পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে মানবের চির-মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না।

১৪। পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষমার অধিকার থাকে না।

১৫। পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে সৃষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি হইত না।

১৬। পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে কোন কোন জন্তুর সংখ্যা একেবারে লোপ পাইত না।

১৭। শীত গ্রীস্ম ইত্যাদি ঋতুর প্রভাব কোন কোন বৈষম্যের কারণ হইতেছে দেখিয়া পূর্ব্ব-জন্মকে সেই সকল বৈষম্যের কারণ মনে করিবার কোন হেতু থাকে না।

১৮। বর্ত্তমান জন্ম পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফল হইলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে দয়ালু ও কৃপালু স্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল ছাড়া তিনি নিজ হইতে কিছুই দিতে পারেন না।

১৯। জগতের যাবতীয় বস্তু পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে হইয়া থাকিলে সৃষ্টি-কর্ত্তাকে শাসন-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

২০। পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে জগত-পিতা আমাদের কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন, এই কথা স্বীকার করিতে পারি না।

২১। পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকৃত হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা হয়। আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রের কোন প্রভাব আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কখনও পরিলক্ষিত হইত না। ত্রৈহস্পর্শেরও মাহেন্দ্রযোগের বিচার করিয়া চলার কোন কারণ থাকে না।

তবে বৈষম্যের কারণ কি?

জগৎ বৈচিত্রময় সত্য; কিন্তু এই বৈচিত্রের মধ্যে যদি সুখ দুঃখের তারতম্য না থাকিত তাহা হইলে এই বৈচিত্রের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না। সুখ ও দুঃখের তারতম্য দেখিয়াই কেহ কেহ আমাদের ইহ-জন্মের পূর্ব্বে আরও জন্ম ছিল বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছে।

আমি বলিতে চাই, জগতে যে সকল বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহার সবগুলিতেই দুঃখ বা সুখের কোন তারতম্য নাই।

বৈষম্য তিন প্রকারের-

১। প্রাকৃতিক বৈষম্য- যেমন মানব জগতে নর ও নারীরূপ বৈষম্য। প্রাণী জগতে মানব, পশু, পক্ষি, বৃক্ষলতাদি রূপ বৈষম্য।

এই সকল বৈষম্যের মধ্যে কোন সুখ ও দুঃখের তারতম্যের অনুভূতি নাই। কাজেই এই বৈষম্যের জন্ম সৃষ্টি-কর্ত্তার ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসিতে পারে না। তিনি কাওকে কোন দুঃখ না দিয়া বৈচিত্রময় সৃষ্টির মধ্য দিয়া জগতের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন।

গরু বৃক্ষলতাদির দুঃখের অনুভুতি আছে; কিন্তু কেহ বলিতে পারিবে না যে, গরুর গো জন্মের জন্য কোন দুঃখ আছে। এবং ইহাও কেহ বলিতে পারিবে না যে নারীর নারী জীবনের জন্ম কোন দুঃখ আছে। কত নারী জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া প্রেমাস্পদের স্ত্রীরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে আন্তরিক বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন। এরূপ স্ত্রী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত কত পুরুষ ও তাহার পুরুষ জন্মের উপর ধিক্কার দিয়া থাকে। পরম সুস্বাদু মিষ্টান্ত ভক্ষণ করিতে মানুষ যেরূপ আনন্দ পায়, সদ্য কচি ঘাস খাইতে গরু এর চেয়ে কম আনন্দ পায় বলিয়া কেহ বলিতে পারিবে না। পূজার বন্ধের সময় ছুটি না পাওয়া কেরানীবাবুর মানসিক কষ্টের চেয়ে রৌদ্রতপ্ত মাঠে কৃষি-কর্ম্মে রত গরুর কষ্ট বেশি তাহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। কারণ সুখ ও দুঃখ অনুভব শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। জীবজগতে অনুভূতির তারতম্য সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তা সুখ দুঃখের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।

২। মানুষের নিজের ইহ-জীবনের কর্ম্মফলস্বরূপ আর এক প্রকারের বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সভাপতি বাল্য জীবনে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখা পড়া করিয়াছেন, বিচারক জীবনে ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; তাই জিলার প্রধান বিচারকের আসন লাভ করিয়াছেন। আর এক জন ন্যায় বিচারের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাই উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, বা লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারে নাই।

৩। পরকৃত বৈষম্য-একের অপরাধে অন্য কষ্ট পায়। দুষ্ট বেনীর লগুড়াঘাতে শিষ্ট গোপালের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায়- ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। এইরূপ আর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে এবং সায়েন্স অফ ইউজেনিকস জানা থাকিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে অনেক সময় পিতামাতা আমাদিগকে জন্মান্ধ, কানা খোড়া করিয়াছেন।

অনেক সময় সমাজের অন্যায় ব্যবস্থা আমাদিগকে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, উচ্চ-নীচ, প্রভু-ভৃত্য-ইত্যাদি দুঃখময় বৈষম্যের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

ইহাকে আমরা পরকৃত বৈষম্যের অন্তর্গত মনে করি- এবং ইহাও ইহ-জন্মেরই কর্ম্মফল স্বরূপ প্রত্যাক্ষিভূত হইতেছে; সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষপাতিত্বের জন্যও নয় আমাদের পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফল স্বরূপও নয়।

তবে-মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়- ইহা বুঝিতে হইলে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে কোথা হইতে আসিয়াছে।

মাটি হইতে ঘাস, ঘাস হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে রক্ত-পিন্ড, মাংস-পিন্ড ইত্যাদি অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমোন্নতি করিতে করিতে মানব দেহ ও তন্মধ্যে আত্মার বিকাশ হইয়াছে। ও মাতৃগর্ভরূপ ক্ষুদ্র জগৎ হইতে বৃহত্তর জগতে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া আমাদের চলার বিরাম নাই এবং ক্রমশঃ উন্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একটা পূর্ণতায় পৌছিয়াছি।

মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী; মানুষের যাত্রার বিরাম নাই, মানুষ আর পিছনের দিকে ফিরিয়া আসে না।

মানব-প্রকৃতি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতেছে না। মানুষ যত পায় আরও পাইতে চায়; মানুষের পিপাসার তৃপ্তি নাই, আকাঙ্খার নিবৃত্তি নাই। যত পায় আরও পাইতে চায়, তারপর আরও পাইতে চায়। মানুষের এই প্রকৃতিগত অদম্য

পিপাসা অসীম আকাঙক্ষা দেখিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃত পক্ষে মানুষ সসীম কিছুই চাহে না, মানুষের অসীম ভোগ বিলাসের প্রতি ধাবিত হওয়া অসীমকে চাওার প্রকৃতির বিকৃত বিলাস মাত্র।

অসীমকে পাওয়ারও শেষ হইতে পারে না, মানুষের পাইতে থাকার পথে চলারও শেষ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছিলাম মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী।

অনন্তকে পাইতে থাকা, আরও পাইবার জন্য আরও অগ্রসর হইতে থাকা - এই চাওয়া ও পাওয়া এবং অনন্তকাল যাবৎ পাইতে থাকাই মানব জীবনের চরম ও পরম স্বার্থকতা।

(পাক্ষিক আহমদী ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।)

সঙ্কেত পঞ্জী

১. আকবর শাহ নাজবি আবাদী-মিরকাতুল একিন, ভূমিকা পৃষ্ঠা নং-২৩।

২. হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড।

৩. মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ-জযবাতুল হক (উর্দূ)।

৪. মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ-জযবাতুল হক (উর্দূ)।

৫. মাসিক আল-ফোরকান রওশান আলী স্মৃতি সংখ্যা।

৬. দৈনিক আল্ ফযল ১৫ইং মার্চ, ১৯২৩ ইং।

৭. সুলতান আহমদ-সিরাতে হযরত হাফেয রওশান আলী পৃষ্ঠা-২০।

৮. দৈনিক আল্-ফযল ২৭মে, ১৯২০ইং।

৯. রিপোর্ট মজলিসে শূরা।

১০. বর্ণনায় জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

১১. বর্ণনায় জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

১২. পাক্ষিক আহমদী জুন, ১৯৩৭ইং।

১৩. বর্ণনা এডভোকেট উবায়দুর রহমান ভূইয়া।

১৪. বর্ণনা হাফেজ সেকান্দার আলী।

১৫. বর্ণনা এডভোকেট ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া।

১৬. বর্ণনা জনাব বি.এ.এম. এ সাত্তার।

১৭. বর্ণনা জনাব ফজলুল করিম মোল্লা।

১৮. বর্ণনা মিসেস এ.টি.এম. হক।

১৯. বর্ণনা মিসেস এ.টি.এম. হক।

২০. জনাব আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাঈল-পাক্ষিক আহমদী ৩০ নভেম্বর ১৯৬৮ইং।

২১. বর্ণনা মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী।

২২. বর্ণনা জনাব নুরুদ্দীন আহমদ খান সাহেব।

২৩. বর্ণনা জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী (নারাণয়গঞ্জ)।

২৪. মাসিক রিভিউ অব রিলিজিয়ন নভেম্বর ১৯৫৫।

২৫. দৈনিক আল্ ফযল ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬।

২৬. পাক্ষিক আহমদী, ১৫জুন, ১৯৩৬ইং।

Allama Zillur Rahman

A short biographical sketch of Allama Zillur Rahman (1895 - 1964 A.D), a pioneer Ahmadi of Bangladesh who worked as a missionary in undivided Bengal and later in Bangladesh for a period of more than thirty years. He came from a renowned qari family of Bengal, had his early education in Brahmanbaria, got his religious education from Senior Govt, Madrasa Dhaka, which later came to be known as Madrasa Aalia, Dhaka. Having migrated to Quadian in 1916 and having dedicated his life, he received intensive and extensive education and training for his assignment as a missionery. He was one of the earliest pupils of Hazrat Hafeez Roshan Ali of the blessed memory. He traveled widely in Bengal from Panchagar in the north to Patwakhali in the south and established number of jamaats in undivided Bengal. One of his living memories is his monumental work **"HADITHUL MAHDI"** in Bengali language. He died in Narayanganj, Bangladesh in 1964 and was buried in Rabwah, Pakistan.

Allama Zillur Rahman
(A short biographical sketch)
by
Mujeeb-ur-Rahman

Published by
Hamidur Rahman
55/1, Central Basabu
Dhaka-1214